পরিবেশ বিজ্ঞান

সুব্রত কুমার সাহা

পরিবেশবিজ্ঞান

BANSDOC Library
Dhaka

ড. সুব্রত কুমার সাহা
সহযোগী অধ্যাপক
পরিবেশবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

BANSDOC Library
Accession No 20221
Date 25.6.09 Sign

বাংলা একাডেমী ঢাকা

পরিবেশবিজ্ঞান
(জীব ও প্রাকৃতিক পরিবেশবিষয়ক)

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৪ /জুন ২০০৭

বাএ ৪৫৭৫
(২০০৬–২০০৭ : পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ৭)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞানও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ৩২২

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ মোহসীন

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

PORIBESHBIJNAN (Environmental Science) by Dr. Subrota Kumar Saha. Published by Dr. Abdul Wahab, Director (In charge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000. Bangladesh. First Published : June 2007.

Price : Taka 80.00 only.

ISBN 984-07-4585-9

ভূমিকা

আমাদের চারপাশের পরিবেশ আমাদের সবকিছুর সাথেই সম্পৃক্ত। এজন্য পরিবেশ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে জানার জন্য মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় সহজতর করে 'পরিবেশবিজ্ঞান' গ্রন্থটি আধুনিক উপাত্তসহ সজ্জিত করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি পরিবেশবিজ্ঞানে অধ্যয়নরত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে তাঁদের পাঠ্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়নে অনেক লেখক ও গবেষকদের রচনাবলির সহায়তা নেয়া হয়েছে। সেজন্য আমি সকল বিশেষজ্ঞদের প্রতি কৃতজ্ঞ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন সর্বতোভাবে সহায়তা করায় আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ত্রুটিগুলো সংশোধনের পরামর্শ দানে পাঠকবৃন্দের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সর্বোপরি বাংলা একাডেমী এই গ্রন্থটি প্রকাশ করায় আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও গর্ববোধ করছি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সুব্রত কুমার সাহা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পরিবেশের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব		**১**
১.১.	পরিবেশের সংজ্ঞা	২
১.২.	পরিবেশের উপাদান	২
১.৩.	পরিবেশের প্রকারভেদ	২
১.৪.	পরিবেশের গুরুত্ব	২
১.৫.	জীবের বাসস্থান হিসেবে পৃথিবী	৪
১.৬.	পরিবেশের দর্শন	৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাকৃতিক পরিবেশ		**৭**
২.১.	প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উপাদান	৭
২.২.	পৃথিবীর উপাদান	৭
২.৩.	পৃথিবী উৎপত্তির মতবাদ	৯
২.৪.	বায়ুমণ্ডলের গঠন ও স্তর ভাগ	১১
২.৫.	শিলামণ্ডল	১২
২.৬.	বারিমণ্ডল	১৪
২.৭.	জীবমণ্ডল	১৫
তৃতীয় অধ্যায় : জৈবিক পরিবেশ		**১৭**
৩.১.	জীবন	১৭
৩.২.	জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ	২১
৩.৩.	প্রাকৃতিক আবাসভূমি ও জৈবিক পরিবেশ	২৯
৩.৪.	বায়োম	৩২
চতুর্থ অধ্যায় : বাস্তুতন্ত্র		**৩৫**
৪.১.	বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা	৩৫
৪.২.	বাস্তুতন্ত্রের উপাদান	৩৫
৪.৩.	খাদ্য শৃঙ্খল	৩৭
৪.৪.	খাদ্য পিরামিড বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড	৩৮
৪.৫.	বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন তন্ত্রের সাংগঠনিক পর্যায়	৩৯

৪.৬. সালোকসংশ্লেষণ ৪২
৪.৭. কার্বন চক্র ৪৩
৪.৮. নাইট্রোজেন চক্র ৪৪
৪.৯. সামুদ্রিক অবক্ষেপ ৪৬
৪.১০. জীববৈচিত্র্য ৪৮

পঞ্চম অধ্যায় : শক্তি ও পরিবেশ **৪৯**
৫.১. সম্পদ ৪৯
৫.২. শক্তি ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানব প্রতিবেশবিদ্যা **৫৩**
৬.১. পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক ৫৩
৬.২. কৃষিকাজের বিকাশ ৫৩
৬.৩. পরিবেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক ৫৪
৬.৪. পরিবেশকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা ৫৪
৬.৫. সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যার প্রভাব ৫৭

সপ্তম অধ্যায় : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবেশ **৫৯**
৭.১. ধস ৫৯
৭.২. ভূমিকম্প ৬১
৭.৩. ভূমিক্ষয় ৬২
৭.৪. খরা ৬৫
৭.৫. বন্যা ৬৭
৭.৬. সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় ৬৯
৭.৭. নদী পাড়ের ভাঙন ৭২
৭.৮. উপকূল ভাঙন বা সমুদ্রতটের ভাঙন ৭২
৭.৯. সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার পরিবেশগত গুরুত্ব ৭৪

অষ্টম অধ্যায় : পরিবেশ দূষণ **৭৫**
৮.১. পরিবেশের অবক্ষয় এবং দূষণের উৎস ৭৫
৮.২. বায়ু দূষণ ৭৬
৮.৩. পানি দূষণ ৭৯
৮.৪. আর্সেনিক দূষণ ৮৩
৮.৫. শব্দ দূষণ ৮৪

৮.৬. কীটনাশকের দূষণ ৮৬
৮.৭. তেজস্ক্রিয় দূষণ ৮৭
৮.৮. পারমাণবিক শক্তি ও নিরাপদ পরিবেশ ৮৯

নবম অধ্যায় : পরিবেশ : সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ৯০
৯.১. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ৯০
৯.২. জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ৯২
৯.৩. অভয়ারণ্য ৯২
৯.৪. জলাভূমি ৯৪
৯.৫. অনুর্বর ভূমি ৯৬
৯.৬. স্থিতিশীল উন্নয়নে পরিবেশগত গুরুত্ব ৯৭

দশম অধ্যায় : পরিবেশবাদী আন্দোলন ও আইন ৯৯
১০.১. গ্রিন পিস আন্দোলন ৯৯
১০.২. স্টকহোম সম্মেলন ৯৯
১০.৩. বসুন্ধরা সম্মেলন ১০০
১০.৪. নর্মদা প্রকল্প ১০০
১০.৫. পরিবেশ আইন ১০০
১০.৬. পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ১০৩
১০৭. পরিবেশের উপর মানুষের চাপ ও কাজের মূল্যায়ন ১০৪
১০.৮. নারী ও পরিবেশ ১০৫
১০.৯. বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ১০৬
১০.১০. গ্রিন হাউস প্রভাব ১০৯
১০.১১. আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়বদ্ধতা ও করণীয় ১১৭
১০.১২. পরিবেশ দূষণের অন্যান্য উপাদান ১১৯
১০.১৩. পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় ১২০

বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ ১২৫

তথ্যপঞ্জি ১৩১

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

Definition and importance of Environment

প্রকৃতির সবগুলো দান একসাথে মিলেমিশে তৈরি হয়েছে পরিবেশ। পাহাড়, নদী, বন, জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, পানি, মাটি, জীবজন্তু, মানুষ—এ সবগুলোকে নিয়ে পৃথিবীর এ পরিবেশ গড়ে উঠতে সময় লেগেছে প্রায় ৫০০ বছর। পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে। পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায় ২৩৮ মিলিয়ন বছর পূর্বে। ১৪০ মিলিয়ন বছর পূর্বে সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। মানুষ এসেছে আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। তার ফল হয়েছে কিছু ভাল, কিছু মন্দ। এই মন্দ প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার সার্বিক সচেতনতা। একথা সত্য যে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাণ পরস্পর পরিপূরক। একটির অস্তিত্বের সাথে অন্যটির অস্তিত্ব এবং একটির পরিবর্তনের সাথে অন্যটির রূপান্তরও অবধারিত। এই পরিবর্তনের কারণে ভূ-তাত্ত্বিক যুগ থেকে কোটি কোটি জীব সৃষ্টি হয়েছে আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি বিশালাকার ডাইনোসরও প্রকৃতি ও পরিবেশের পরিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পরিবর্তনের অনেকাংশে ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে মানুষের সাহায্যে। তাই মানবজাতির সামনে তার অস্তিত্বের বিষয়টি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। দূষণ (Pollution) দারিদ্র্য (Poverty) এবং জনসংখ্যা (Population) এই তিনটি সমস্যা একবিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১.১. পরিবেশের সংজ্ঞা

উদ্ভিদ প্রাণী ও মানুষকে ঘিরে সার্বক্ষণিক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজমান সে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে। সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে ; যেমন ঢাকা শহরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিয়েই উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ বেঁচে আছে এবং বেড়ে উঠছে। যাহোক, পরিবেশের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা যায়, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন, সে অবস্থাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ তৈরি হতে প্রয়োজন পানি, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছেন যেমন— আমর্স, ১৯১৪ সালে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নামক গ্রন্থে পরিবেশের সংজ্ঞায় বলেছেন, জীব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

উল্লেখ্য যে, আমর্স যাকে জৈব অবস্থা বলেছেন, পরিবেশ বিজ্ঞানী বট্‌কিন্‌ ও কেলার তাকেই সাধারণভাবে জৈব কারণ বলেছেন। তেমনি অজৈব কারণ আর প্রাকৃতিক অবস্থা প্রায় একই জিনিস।

১.২. পরিবেশের উপাদান

পরিবেশের উপাদান দুই ধরনের। যথা– জীব এবং জড়। জীব বলতে পরিবেশের সেই উপাদানগুলোকে বুঝায় যার জীবন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যেমন গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ। জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে পানি, বাতাস, মাটি আলো, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি।

১.৩. পরিবেশের প্রকারভেদ

পরিবেশ দুই ধরনের যেমন, (ক) ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং (খ) সামাজিক পরিবেশ। ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে পৃথিবীর সব জড় ও জীবের উপাদানের সমষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ পানি, বাতাস, মাটি, আলো, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সবকিছুকে নিয়ে হলো ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ। অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশ হলো মানুষের তৈরি পরিবেশ। মানুষের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সবকিছুর সমষ্টি হলো সামাজিক পরিবেশ। এই পরিবেশের মূল উপাদান হলো সংস্কৃতি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করেছে পৃথিবী নিজে। এই পরিবেশের বয়স পৃথিবীর বয়সের কাছাকাছি। এটি অতি প্রাচীন পরিবেশ। এই পরিবেশ সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে, আবার সামাজিক পরিবেশ মানুষের তৈরি। সামাজিক পরিবেশের বয়স প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীতে মানুষ আসার পরে ধীরে ধীরে এই পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিবেশও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

১.৪. পরিবেশের গুরুত্ব

পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনা কোনো নতুন বিষয় নয়। পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সমাজচিন্তা ও বৈজ্ঞানিক ভাবনায় পরিবেশ বিভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। হোমারের সাহিত্যে, কনফুসিয়াসের বাণীতে, অ্যারিস্টটলের সমাজ–চিন্তায়, আল্‌বেরুণীর পর্যবেক্ষণে; লিওনার্দো–দা–ভিঞ্চির বিজ্ঞান চেতনায় পরিবেশ ও মানুষের বিষয় এবং পরিবেশের প্রতি মানুষের ও মানুষের প্রতি মানুষের করণীয় বিষয় সুস্পষ্ট।

তবে আজ যেভাবে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা–চিন্তা শুরু হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ পরিবেশের ভাল–মন্দ নিয়ে ভাবছেন, আগে এত লোক একসাথে পরিবেশ নিয়ে এভাবে ভাবেননি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে প্রথমেই মনে হবে আগে দার্শনিক চিন্তা–ভাবনা করার মতো মানুষ কম ছিল, এখন দার্শনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিষয়টি তা নয়। আসলে, যেমন শরীর যতদিন সুস্থ থাকে সাধারণত মানুষ শরীর নিয়ে ভাবে না, তেমনি পরিবেশ যতদিন সুস্থ ছিলো, স্বাভাবিক ছিলো, ততদিন মানুষ পরিবেশ নিয়ে এত চিন্তা–ভাবনা

করেনি। এখন পরিবেশের নানা দিকে সমস্যা দেখা দিয়েছে, পানি–মাটি–বাতাস দূষিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ছে, শহর বাড়ছে, আবর্জনা বাড়ছে। মানুষ প্রকৃতিকে জেনে হোক বা না জেনে হোক পরিবর্তন করে ফেলেছে। বন কেটে শহর তৈরি করছে, ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে, কলকারখানা তৈরি করছে। জলাভূমি ভরাট করে বাড়ি তৈরি করছে, ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র পরীক্ষা করছে, মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে এবং জীবন-জীবিকার জন্য জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামপ্রদ করার জন্য প্রকৃতির সম্পদকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে। পৃথিবীর ভাণ্ডার যে অসীম নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। তাই প্রকৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

সুতরাং পরিবেশবাদ হলো অখণ্ড মানবজাতির সুস্থ স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব করে বেঁচে থাকার মতবাদ। এই মতবাদের ব্যাপ্তি হলো গোটা পৃথিবী। সুতরাং এদের সবাইকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবী যে পরিবেশ তৈরি করছে তাকে নষ্ট করে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। এই পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১.৪.১. পরিবেশ পাঠের প্রয়োজনীয়তা : পরিবেশবিদ্যা পাঠের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ—

১) পরিবেশের উৎপত্তি, তার উপাদান এবং সেই উপাদানগুলো কিভাবে নিজেদের মধ্যে কাজ করে সে সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

২) পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কিভাবে জীবজগতের উদ্ভব হয়েছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তৈরি হয়।

৩) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের জন্য খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশের বিষয়ে জানা যায়।

৪) পরিবেশ পাঠের মধ্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মায়। বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টির যোগান, শক্তির প্রবাহ এবং পুষ্টির যোগান অনুসারে প্রজাতির সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি–না তা বুঝতে পারা যায়।

৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কেন সৃষ্টি হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি কি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের কত ক্ষতি করে তা বুঝতে পারা যায়।

৬) মানুষ নিজে পরিবেশের কতটা ক্ষতি করে, সেই আত্ম–সমীক্ষার জন্যও পরিবেশ বিষয়ে পাঠ নেয়া দরকার। বিভিন্ন রকমের দূষণ যেমন— বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদির মাত্রা কতটা তা পরিবেশবিদ্যা থেকেই জানা যায়।

৭) পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য এবং যে মানুষ পরিবেশের ক্ষতি করে, সেই মানুষকে তার অপরাধের জন্য কি শাস্তি দেওয়া যায়, সেই আইনগত ব্যবস্থাগুলো জানার জন্য পরিবেশ বিজ্ঞান জানতে হয়।

৮) এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যে জনসচেতনতার প্রয়োজন, সেই সার্বিক চেতনা তৈরি করার বিষয়ে পরিবেশ পাঠের কোন বিকল্প নেই।

৯) এছাড়া গ্রিনহাউজ গ্যাস, তার উৎপত্তি ও প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

১০) বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টি পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও তার বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার পরিবেশ বিদ্যারই অংশ বিশেষ।

১.৫. জীবের বাসস্থান হিসেবে পৃথিবী

পৃথিবী ছাড়া আমাদের সৌরজগতে আর কোথাও জীব ও জীবনের অস্তিত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। জীবনের দুটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয় জিনিস হলো পানি ও অক্সিজেন। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে আজ পর্যন্ত যত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন, মহাকাশযান পাঠিয়েছেন, তার কোনোটিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে সূর্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সৌরজগতের আর কোনো গ্রহে প্রাণের স্পন্দন আছে। হয়তো ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেও পারে। আমরা জানি, জীবন সৃষ্টির মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এছাড়া খনিজ লবণ যাদের উৎস হলো লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও পানি। পরিবেশের এই উপাদানগুলো দীর্ঘ প্রায় ৪৫০ কোটি বছর ধরে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া ও পরিবর্তন ঘটিয়ে এককোষী থেকে বহুকোষী জীবের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। ফলে শুধু যে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, এই জীবজগৎ প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করেছে নানাভাবে। উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে আদি বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বোহাইড্রেট আর অক্সিজেন তৈরি করেছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ভাঙার কাজ শুরু হতেই পৃথিবী আরও তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। এভাবে স্থলভাগ ও জলভাগের বায়োম সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর পানি, বাতাস, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু সবাই পরস্পরের সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি করেছে নিজেদের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ।

পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জীবনের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণসমূহ ফুটিয়ে তোলার জন্য বা সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য অথবা জীবনের উদ্ভবের জন্য একান্ত প্রয়োজন—সেই অনুকূল পরিবেশই সেই গ্রহগুলোতে নেই।

১.৫.১. পৃথিবীর আকৃতিবিষয়ক কিছু তথ্য : জীবের বাসস্থান এই পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

১) বিষুবীয় অঞ্চল কিছুটা উঁচু কিন্তু মেরু অঞ্চল সমতল।

২) উত্তর গোলার্ধে অধিকাংশ স্থলভাগ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অধিকাংশ জলভাগ অবস্থিত।

৩) উত্তর মেরু আর্কটিক সাগরে অবস্থিত, অপর পক্ষে দক্ষিণ মেরু অবস্থিত অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে।

৪) পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে অর্থাৎ প্রতিপাদ অঞ্চলে বিপরীত দৃশ্য বিদ্যমান অর্থাৎ এক গোলার্ধে স্থলভাগ হলে অন্য গোলার্ধে একই স্থানে জলভাগ অবস্থিত।

৫) স্থলভাগ ও জলভাগ মোটামুটিভাবে ত্রিভুজাকার।

৬) আলপাইন–হিমালয় পর্যন্ত শ্রেণী বিষুবরেখার সমান্তরাল।

সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীতে জীবনের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে। কারণ—

১) পৃথিবী সূর্য থেকে এমন এক নিরাপদ দূরত্বে আছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে গড় উষ্ণতা সারা বছর ২২° সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে। এই উষ্ণতা জীবজগতের পক্ষে অনুকূল।

২) পৃথিবীর ভর এবং অভিকর্ষ বল এমন একটা সুন্দর সামঞ্জস্য তৈরি করেছে যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসগুলো ঠিক ঠিক মাত্রায় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ধরা আছে। আর তার ফলেই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

৩) জীবনধারণের অন্যতম শর্ত হলো পানি। পৃথিবীতে জলের যোগান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য রয়েছে বারিচক্র বা হাইড্রোলজিক্যাল সাইক্ল। পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও বারিচক্র নেই।

৪) পৃথিবীর বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল জীবজগতের উদ্ভব ও বিকাশের অনুকূল। অক্সিজেনের উপস্থিতি এখানে জীবের শ্বাস–প্রশ্বাসে সাহায্য করে। এছাড়া বিপাক, জারণ, বিজারণ প্রভৃতি কাজের জন্য দরকারি অক্সিজেনের যোগানও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া যায়।

৫) পৃথিবীতে জীবজগতের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য জীব ভূ–রাসায়নিক চক্রগুলো সবসময় কাজ করে চলেছে। কার্বনচক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেনচক্র প্রভৃতির সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্যাসের যোগান অবিঘ্নিত থাকে। ফলে পৃথিবীতে জীবনের প্রবাহ স্তব্ধ হয় না।

৬) পৃথিবীর মাটি উদ্ভিদ জগৎকে পুষ্টি যোগায়। অণুজীবীদের বসবাসের বাসস্থান দেয় সুতরাং পৃথিবী সৌরজগতের মধ্যে একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ আছে ও জীবজগৎ আছে। এই কারণে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে মহাশূন্যে ছুটে চলা মহাকাশযানের সাথে তুলনা করেছেন।

১.৬. পরিবেশের দর্শন

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে জীবের উদ্ভব, বিকাশ এবং সর্বশেষ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর এ ইতিহাস ভূতাত্ত্বিক যুগের বিভিন্ন ফসিল থেকে জানা যায়। মাত্র ২০ লক্ষ বছর পুরনো মানুষের ইতিহাস। বিকাশের অভূত–পূর্ব উন্নতি এ পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বর্তমান পৃথিবীর প্রধান সমস্যা পরিবেশ বিপর্যয়। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে আমাদের শিখতে হবে কিভাবে এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজ অনেকক্ষেত্রেই মনুষ্যসৃষ্ট। একে রক্ষা করতে হলে আমাদের জানতে হবে এর দর্শন ও সামাজিক পটভূমি। তদুপরি পরিবেশের সহনশীল প্রযুক্তি

উদ্ভাবন বাড়াতে হবে। শুধু তাই নয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমির ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বনায়ন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক দিকগুলোকে সংখ্যার বিচারে এক নাম্বার হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তত্ত্বগতভাবে আমাদের পৃথিবীর অবস্থান নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে —

তত্ত্ব ১ : পৃথিবী একটি আবদ্ধ ধারা।

অর্থাৎ পৃথিবীর উপাদান যেমন বায়ুচক্র, পানিচক্র, জীবচক্র এবং ভূ-পৃষ্ঠ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যে কোনো এক চক্রের উপাদানের সামান্যতম পরিবর্তন অন্য চক্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তত্ত্ব ২ : পৃথিবীই একমাত্র বসবাসের উপযুক্ত স্থান এবং এর সম্পদ সীমিত।

অর্থাৎ পৃথিবীই একমাত্র বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং এর সম্পদ সীমিত যদিও কিছু সম্পদ পুনঃব্যবহার করা যায়।

তত্ত্ব ৩ : প্রাকৃতিক পরিবেশ ভূ-তাত্ত্বিক যুগ থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান এ পরিবর্তন শুধু প্রাকৃতিকই নয় অনেকটাই মনুষ্যসৃষ্ট।

তত্ত্ব ৪ : কিছু কিছু প্রকৃতির ধারাগুলো মানুষের জন্য দুর্যোগপূর্ণ। এ সমস্ত দুর্যোগগুলো নিরূপন করা এবং মানুষ ও সম্পদ রক্ষার কাজ ত্বরান্বিত করা আবশ্যক।

তত্ত্ব ৫ : জমি ও পানির ব্যবহার এবং এর পরিকল্পনার সাথে অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং এর পারিপার্শ্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করা।

তত্ত্ব ৬ : জমির ব্যবহার ক্রমিক গতিতে ব্যবহার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ

Natural Environment

২.১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উপাদান

পরিবেশের যে উপাদানগুলো প্রকৃতি নিজেই তৈরি করেছে সেই উপাদানগুলোর সমষ্টি হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। যেমন— পানি, বায়ু, মাটি ইত্যাদি। আজ যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমরা বসবাস করছি, আমাদের সমাজ অর্থনীতি গড়ে তুলেছ তা তৈরি করতে পৃথিবী সময় নিয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি বছর। প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন তার মধ্যে বড় হয়ে ওঠা গাছপালা জীবজন্তুকে প্রভাবিত করে ; তেমনি মানুষের গায়ের রঙ, দৈহিক গঠন, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুর উপরেই প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে।

প্রকৃতি নিজে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি জীবের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে উপাদানগুলো তৈরি করেছে, সেই উপাদানগুলোর সমষ্টিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। প্রাকৃতিক পরিবেশের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে যেমন—

(ক) **জীব উপাদান :** ইংরেজিতে একে বায়োটিক কমপোনেন্ট বা লিভিং কমপোনেন্ট বলে। যেমন— ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, মাছ, ব্যাঙ, বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ, শ্যাওলা, গাছপালা ইত্যাদি। এই উপাদানগুলোর জীবন আছে তাই—এরা সজীব উপাদান।

(খ) **জড় উপাদান :** ইংরেজিতে জড় উপাদনকে অ্যাবায়োটিক কমপোনেন্ট বা নন্-লিভিং কমপোনেন্ট বলে। যেমন— আলো, পানি, বিভিন্ন গ্যাস, মাটি, তাপমাত্রা ইত্যাদি। এই উপাদানগুলোর প্রাণ নেই, কিন্তু জীবন ধারণে সাহায্য করে—তাই এরা জড় উপাদান।

২.২. পৃথিবীর উপাদান

পৃথিবী জীবন, সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের উৎস। সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে। তাই পৃথিবী জীবনের উৎস, প্রাণের ধারক ও বাহক।

পৃথিবীর চারটি উপাদান যেমন—

(১) বায়ুমণ্ডল (atmosphere)

(২) শিলামণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল (lithosphere)

(৩) বারিমণ্ডল (hydrosphere) এবং

(৪) একটি সজীব উপাদান অর্থাৎ জীবমণ্ডল (biosphere)।

২.২.১. বায়ুমণ্ডল : ভূ–পৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। শিলামণ্ডল ও বারিমণ্ডলের মতো বায়ুমণ্ডল পার্থিব পরিবেশের অবিভাজ্য অংশ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে ভূ–পৃষ্ঠের সঙ্গে এই গ্যাসীয় অবরণ সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু বায়ুমণ্ডল কঠিন ভূমির সাথে সমভাবে চলতে পারে না বরং সামান্য পশ্চাতে পড়ে থাকে। বায়ুমণ্ডল স্তরে স্তরে সজ্জিত। তাই উচ্চতার সাথে সাথে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে। স্তরগুলো নিচের দিক হতে উপরের দিকে ক্রমশঃ হালকা। উপরের স্তরগুলো নীচের স্তরগুলোকে চাপ দিচ্ছে বলে নিচের শুরু খুবই ঘন ও ভারী।

২.২.১.১. বায়ুমণ্ডলের উপাদান : বায়ুমণ্ডল নানা প্রকার উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। ভূ–পৃষ্ঠ হতে প্রায় ৯০ কি.মি. পর্যন্ত রাসায়নিক সংযুক্তি বা গ্যাসের অনুপাত সমান থাকে বলে এ অংশকে হেমোস্ফিয়ার বলে। উপরের স্তরে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত একই ধরনের থাকে না বলে তাকে হেটোরোস্ফেয়ার বলে।

সারণি ২.১ : বায়ুমণ্ডলে প্রধান গ্যাসীয় উপাদানগুলোর পরিমাণ (০.২৫ কিলোমিটার)

উপাদান	শতকরা হার
১. নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০৮
২. অক্সিজেন (O_2)	২০.৯৪
৩. আর্গন (Ar)	০.৯৩
৪. কার্বন ডাই–অক্সাইড (CO_2)	০.০৩
৫. অন্যান্য গ্যাস যেমন– নিয়ন (Ne) + হিলিয়াম (He) + ওজোন (O_3) + হাইড্রোজেন (H_2) + ক্রিপ্টন (K_r) + জেনন (Xe) + মিথেন (CH_4)।	০.০২
৬. জলীয় বাষ্প।	০.০২
মোট :	১০০%

* ⟹ নিয়ন = ০.০০১৮%, হিলিয়াম = ০.০০০৫%, ওজোন = ০.০০০০৬%, হাইড্রোজেন = ০.০০০০৫%, ক্রিপ্টন = সামান্য, জেনন = সামান্য, মিথেন = সামান্য এবং এগুলোর শতকরা হার পরিবর্তনশীল।

বায়ুমণ্ডলের মৌলিক পদার্থগুলোর পরিমাণের তারতম্য অনুসারে হেটারোস্ফেয়ারের মধ্যে চারটি উপস্তর লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

১) পারমণবিক নাইট্রোজেন স্তর : উচ্চতা ১০০–২০০ কি.মি.

২) পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর : উচ্চতা ২০০–১,০০০ কি.মি.

৩) হিলিয়াম স্তর : উচ্চতা ১,০০০–৩,৫০০ কি.মি.

৪) হাইড্রোজেন স্তর : উচ্চতা ৩,৫০০–১০,০০০ কি.মি.

আবার, আয়নিত মাত্রা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে হেটোরোস্ফিয়ার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—

১) আয়নমণ্ডল : উচ্চতা ১০০–৩০০ কি.মি.

২) বহির্মণ্ডল বা এক্সোস্ফেয়ার : উচ্চতা ৩০০ কি.মি. থেকে প্রায় ১,০০০ কি.মি.

৩) ম্যাগনেটোস্ফেয়ার : উচ্চতা ১,০০০ কি.মি. থেকে শুরু, ঊর্ধ্বসীমা অনির্দিষ্ট।

আয়নমণ্ডলকে পুনরায় বিভিন্ন ছোট ছোট বলয়ে বিভক্ত করা যায় ; কেননা এই ক্ষুদ্র স্তরগুলোর বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করা ও মেরুপ্রভা (aurora) সৃষ্টি করার ক্ষমতা আলাদা।

২.৩. পৃথিবী উৎপত্তির মতবাদ

অতি প্রাচীনকাল হতে পৃথিবী এবং সৌরজগতের উদ্ভব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ নানা প্রকার মত প্রকাশ করেন। সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি যে নীহারিকা (nebula) হতে সৃষ্ট সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা আজ নিশ্চিত। কিন্তু কি প্রকারে সেটি সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই বিষয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো মতবাদের উদ্ভব হয়েছে এদের মধ্যে নিম্নলিখিত মতবাদগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২.৩.১. নীহারিকা মতবাদ : এ সমাজে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. কান্টের মতবাদ (Kant's hypothesis) : অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জার্মান দার্শনিক কান্ট তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদ নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত। তিনি মনে করতেন অতীতে একটি ঘূর্ণায়মান প্রসারিত নীহারিকা ছিল। এই নীহারিকার অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলো পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ওদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরূপে শীতল নীহারিকাটি একটি বিশাল উত্তপ্ত নীহারিকায় পরিণত হয়। অভ্যন্তরের বস্তুগুলোর ক্রমাগত সংঘর্ষের দরুন কেন্দ্রাতিক শক্তির সাহায্যে পর পর কয়েকটি আংটির ন্যায় বস্তু মূল নীহারিকা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। এই আংটিগুলো ঘনীভূত হয়ে গ্রহসমূহের সৃষ্টি করে। নীহারিকাটির অবশিষ্টাংশ বর্তমান সূর্যের আকার ধারণ করলো। এরূপে গ্রহগুলো হতে আবার উপ-গ্রহসমূহের সৃষ্টি হয়। কান্টের মতবাদ অনুযায়ী এভাবে সৌরজগতের উৎপত্তি হয়। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে এ মতবাদ নির্ভুল নয়।

২. ল্যাপ্ল্যাসের নীহারিকা মতবাদ (The nebular hypothesis of Laplace) : ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী জ্যামিতজ্ঞ ল্যাপ্ল্যাস তাঁর নীহারিকা মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ঘূর্ণায়মান নীহারিকা প্রথম অবস্থা হতেই গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করতো। পরে তাপ বিকিরণের ফলে নীহারিকাপিণ্ড ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে এবং ওর আবর্তন বেশ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন একটা সময় উপস্থিত হয় যখন এর নিরীক্ষা অঞ্চলে কেন্দ্রাতিক শক্তি (centrifugal force) মহাকর্ষ শক্তির সমান হয়ে পড়ল। অবশেষে নিরক্ষীয় এলাকা হতে

আংটির আকারে নীহারিকাটির কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বাষ্পীয় গ্রহের উৎপত্তি হয়। কালক্রমে এরূপে কয়েকটি গ্রহের উৎপত্তি হলো। নীহারিকাটির অবশিষ্টাংশ বর্তমান সূর্যের আকার ধারণ করলো। গ্রহগুলো সৃষ্টি হবার পরেও উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল, পরে তাপ বিকিরণের ফলে প্রথমে তরল ও অবশেষে ওদের পৃষ্ঠদেশে কঠিন আবরণ পড়লো।

ল্যাপ্ল্যাস তাঁর মতবাদের মধ্যে উপগ্রহের উৎপত্তির কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে গ্রহগুলোর উৎপত্তির সময় ওদের বিচ্ছিন্ন অংশ আবার গ্রহগুলোর মতো উপগ্রহে পরিণত হয়। সূর্য গ্রহগুলোর মধ্যে অবস্থিত রইলো এবং গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ও উপগ্রহগুলো নিজ নিজ গ্রহের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে লাগলো। এভাবেই সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছিল—এটা ল্যাপ্ল্যাসের মতবাদ।

নীহারিকা মতবাদের বিরুদ্ধে বহু শক্তিশালী আপত্তি দেখা দিয়েছে। যেমন—

ক. নীহারিকা মতবাদ অনুযায়ী পর পর আংটিগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সূর্যের আবর্তন গতি বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা ধীরগতিতে আবর্তন করে।

খ. আংটির উৎপত্তির সময় সূর্যের নিরক্ষীয় এলাকা অনুভবনীয়ভাবে স্ফীত হওয়া উচিত কিন্তু মেরুর দিকে তা মোটেই সমতল নয়।

গ. এটি খুবই সন্দেহযুক্ত যে বাষ্পীয় আংটিগুলো নীহারিকা হতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরে ঘনীভূত হয়ে গ্রহে পরিণত হয়েছে।

ঘ. ল্যাপ্ল্যাসের মতবাদ অনুযায়ী উপগ্রহগুলো গ্রহের ন্যায় একইদিকে আবর্তন করবে। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির কতগুলো উপগ্রহ আছে যেগুলো মূলগ্রহ যে দিকে আবর্তন করে তার বিপরীত দিকে আবর্তিত হয়। ল্যাপ্লাসের মতবাদ এগুলোর কোনো কারণ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি।

ঙ. বৃহদায়তন গ্রহগুলোর মধ্যভাগে অবস্থান এবং ক্ষুদ্রায়তনের গ্রহগুলো হয় সূর্য হতে দূরে অথবা সূর্যের নিকটে অবস্থান করার কোনো কারণও মতবাদে বলা হয়নি।

৩. **জোয়ার মতবাদ** (Tidal hypothesis) : বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্যার জিন্স (১৯১৯) এবং জেফ্রি (১৯২৯) জোয়ার মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মতে সূর্য অপেক্ষা কয়েকগুণ বড় একটি নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের উপর এক মহাজোয়ার ঘটেছিল। যেমন—চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর সাগরে জোয়ার-ভাঁটা হয়। এজন্য তাঁর মতবাদকে জোয়ার মতবাদ বলা হয়। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মতবাদ আছে। কিন্তু কোনোটাই আজ পর্যন্ত সৌরজগতের উৎপত্তির কারণ নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দেখাতে পারেনি।

২.৩.১.১. বায়ুমণ্ডল ও পরিবেশের সম্পর্ক

বায়ুমণ্ডল ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বায়ুমণ্ডল পানি, বাতাস ইত্যাদি পুনর্ভব শক্তির উৎস। বায়ুমণ্ডল প্রাণিজগতকে অক্সিজেন ও উদ্ভিদজগতকে কার্বন ডাই-অক্সাইড দেয়। বায়ুমণ্ডল অবলোহিত রশ্মি এবং অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জীবজগতকে রক্ষা করে। নাইট্রোজেন প্রোটিনজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করার কাজে লাগে। জলীয় বাষ্প,

বৃষ্টিপাত, মেঘ, তুষারপাত, কুয়াশা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের তাপ শোষেণে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ধূলিকণার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি তাপ বৃদ্ধি পায়। বাতাসের শক্তি উপযুক্ত পরিবেশে মানুষের শ্রম লাঘব করে। বায়ুশক্তির সাহায্যে দানাশস্য পেষাই, পানিসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি নানা কাজ করা যায়।

২.৪. বায়ুমণ্ডলের গঠন ও স্তর ভাগ

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি ৬ কি.মি. উচ্চতার মধ্যে বায়ুমণ্ডলের নব্বই শতাংশ অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরটিকে উষ্ণতা ও উচ্চতা অনুসারে তিনটি অসমান উপস্তরে বিভক্ত করা যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere) **:** এই বলয়টি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গড়ে ১৪ কি.মি. উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত। আকৃতিগতভাবে উপবৃত্তাকার। মেরু অঞ্চলে এই উপস্তরটি ৮ কি.মি. এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১৬ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বায়ুস্তরের বিশেষ বলয়টির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এখানে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, ঘূর্ণবাত, (cyclone), প্রতীপঘূর্ণিবাত (anticyclone) প্রভৃতি দেখা যায়। এখানে উত্তাপের সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যতিক্রম ঘটে এবং তাপ ও চাপের পার্থক্যের কারণে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য স্তরের তুলনায় এর প্রভাব প্রাণী ও মানব জীবনের উপর অপরিসীম। বায়ুমণ্ডল শ্বাস-প্রশ্বাসের সহায়ক গ্যাস সরবরাহ করে, পানিচক্রের মাধ্যমে বৃষ্টি দেয় ও তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে।

ট্রোপোপজ (Tropopause) **:** ট্রোপোস্ফিয়ারে উচ্চতম সীমা এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্নতম সীমার মধ্যে ট্রোপোপজের অবস্থান গ্রিক শব্দ থেকে নেয়া ট্রোপোপজ কথাটির অর্থ যেখানে বাতাসের আলোড়ন স্তব্ধ। এই স্তরে বায়ু প্রায় স্থির ট্রপোপজের নিম্নসীমা থেকে উচ্চসীমা পর্যন্ত তাপমাত্রা একই থাকে। ট্রোপোপজ নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ অবনত বা ঢালু হয়ে রয়েছে। এই বলয়টির মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চলে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত। তবে মেরু অঞ্চলে এর কোন নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে এর উচ্চতা মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলোতে পরিবর্তিত হয়।

খ. স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Ttratosphere) **:** ট্রোপোপজের উচ্চতম সীমান্ত থেকে শুরু হয়েছে স্ট্যাটোস্ফিয়ার। এই স্তরটি মোটামুটিভাবে ১৭ কি.মি. থেকে ৩০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে তাপমাত্রা অপরিবর্তনশীল। এই অঞ্চল বায়ু প্রবাহহীন। ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি কোনো দুর্যোগ এখানে দেখা যায় না। তাই এই শান্ত বায়ুমণ্ডলটির মধ্য দিয়ে জেট বিমান যাতায়াত করে। এই স্তরে ওজোন স্তর থাকায় এটা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করে।

গ. মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere) **:** এটি বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তর। মেসোস্ফিয়ারের ৫০-৯০ কি.মি. উচ্চতার মধ্যে উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ফলে ওজোনমণ্ডলের সর্বোচ্চ সীমানায় উষ্ণতা খুব কমে যায়। ফলে এ মণ্ডল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। মেসোস্ফিয়ারের উর্ধ্বতম সীমানা মেসোপজ (mesopause) নামে পরিচিত। তারপর মহাশূন্যের দিকে প্রায় ১০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত হেটারোস্ফিয়ার বিস্তৃত।

২.৫ শিলামণ্ডল

পৃথিবীর শিলাগঠিত কঠিন বহিরাবরণকে শিলামণ্ডল (lithosphere) বলে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. গভীর পর্যন্ত শিলামণ্ডলের ব্যাপ্তি।

শিলামণ্ডলের নিচে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত আরও দুটি বৃত্তাকার স্তর রয়েছে। ৩০ থেকে ২,৯২৫ কি.মি. গভীর পর্যন্ত অংশকে গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টল বা ব্যারিস্ফেয়ার (mantle/barysphere) বলে। গুরুমণ্ডলের নিচে ২,৯২৫ কি.মি. থেকে ৬,৪০০ কি.মি. পর্যন্ত অঞ্চল সেন্ট্রোস্ফেয়ার (centrosphere বা কেন্দ্রমণ্ডল (core of the earth) নামে পরিচিত।

২.৫.১. শিলামণ্ডলের উপাদান : শিলামণ্ডল আগ্নেয় (igneous), রূপান্তরিত (metamorphic) ও পাললিক (sedimentary) শিলায় গঠিত। ভূ-ত্বকের (crust of the earth) প্রায় ৯৮ শতাংশ অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়ম, লোহা ইত্যাদি আটটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এগুলোর মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

সারণি ২.২ : শিলামণ্ডলের প্রধান উপাদানগুলোর পরিমাণ (মন্টগোমেরি ২০০০)

মৌলিক পদার্থ	সঙ্কেত	শতকরা ভাগ
১. অক্সিজেন	O	৪৬.৭১০
২. সিলিকন	Si	২৭.৬৯০
৩. অ্যালুমিনিয়াম	Al	৮.০৭০
৪. লোহা	Fe	৫.০৫০
৫. ক্যালসিয়াম	Ca	৩.৬৫০
৬. সোডিয়াম	Na	২.৭৫০
৭. পটাশিয়াম	K	২.৫৮০
৮. ম্যাগনেসিয়াম	Mg	২.০৮০
৯. টাইট্যানিয়াম	Ti	০.৬২
১০. সালফার	S	০.০৮
১১. ক্লোরিন	Cl	০.০৫
১২. ফ্লোরিন	Fl	০.০৩
১৩. বেহিয়াম	—	০.০৪
১৪. স্টোনমিয়াম	—	০.০২

আটটি প্রধান মৌলিক পদার্থের মোট পরিমাণ	৯৮.৫৮০%
শিলামণ্ডলের অন্যান্য মৌলিক পদার্থের মোট পরিমাণ	১.৪২%
শিলামণ্ডল গঠনকারী সব মৌলিক উপাদানের মোট পরিমাণ	১০০.০০০%

২.৫.২. শিলামণ্ডলের গুরুত্ব : আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্তটি থেকে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অংশটির উপর সবচেয়ে বেশি অধিকার জারি রেখেছে এবং তার বেঁচে থাকার ও ক্রমিক অগ্রগতির অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করে চলেছে, সেটি হলো পরিবেশের উপাদান শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল মানুষের অসংখ্য কাজের উপযোগী সম্পদের আধার ও উৎস। মৃত্তিকা ভূ-ত্বকের সর্বোচ্চ অংশ। মাটি ছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ অসম্পূর্ণ। মাটি না থাকলে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদজগতের সৃষ্টি হত না। তাছাড়া বনজ ও কৃষিজ সম্পদ আহরণের জন্য মাটি অপরিহার্য উপাদান। ভূ-প্রকৃতি, পরিবহণ ব্যবস্থা ও পরিবহণ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমতল ভূ-ভাগ পরিবহনের জন্য আদর্শ এবং যে কোন অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিকাশের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত জরুরি।

২.৫.৩. শিলামণ্ডলের গঠন : শিলামণ্ডল দুটি অসম ধরনের স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। সবার উপরের স্তরটি ভূ-ত্বক এবং ভু-ত্বকের নিচের স্তরটি ক্ষুব্ধমণ্ডল (substratum) নামে পরিচিত।

ভূ-ত্বক : ভূ-ত্বক কঠিন শিলা ও বিভিন্ন পাত (plate) দিয়ে তৈরি। এই পাতগুলো ক্ষুব্ধমণ্ডলের নমনীয় শিলার উপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। ভূ-ত্বকই পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণ। ভূ-গর্ভের প্রতি ৫০/৬০ ফুট নিচে ১° ফাঃ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ভূ-ত্বক উপাদানের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— সিয়াল (sial) ও সিমা (sima)। ভূ-ত্বকের সবচেয়ে উপরে সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) সমৃদ্ধ শিলা স্তরকে সিয়াল বলে যার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৫–২.৯৫। সিয়াল মহাদেশ বা স্থলভাগ গঠন করে। মহাদেশের নিচে সিয়ালের বিস্তৃতি প্রায় ১৭ কি.মি. পর্যন্ত। গ্রানাইটজাতীয় আগ্নেয় শিলা, নিস ও সিস্ট–জাতীয় রূপান্তরিত শিলা ও বিভিন্ন পাললিক শিলা, যেমন বেলেপাথর, শেল ইত্যাদি সিয়াল এর প্রধান উপাদান। সিয়াল ও সিমার মধ্যবর্তী সীমান্ত কনরাড বিযুক্তি (conrad discontinuity) নামে পরিচিত।

ভূ-ত্বকের সর্বনিম্ন অংশে সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) সমৃদ্ধ শিলা স্তরকে সিমা বলে যার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯৫–৩। সিমা সমুদ্রের তলদেশ তৈরি করেছে। সমুদ্রের নিচে ৫ কি.মি. থেকে ৭ কি.মি. পর্যন্ত সিমার বিস্তৃতি। ব্যাসল্ট (basalt) জাতীয় ক্ষারীয় আগ্নেয়শিলা সিমার প্রধান উপাদান। সিমা–র নিম্ন সীমান্তে রয়েছে মোহো বিযুক্তি (moho discontinuity)

২.৫.৪. গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টল : শিলামণ্ডলের নিচে অর্থাৎ ৩০ কি.মি. গভীরতা থেকে প্রায় ২.৯২৫ কি.মি. গভীরতা পর্যন্ত গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টল বা ব্যারিস্ফেয়ারের (mantle/barysphere) ব্যাপ্তি। আয়রন, কার্বন, সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি পদার্থগুলো এখানে ভু-অভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপ ও তাপের ফলে তরল অবস্থায় রয়েছে। ঘনত্ব অনুসারে ধাতুগুলোর বিন্যাস নিচে হতে উপরের দিকে ক্রমেই শুরু হতে লঘু। এর উপারাংশের ১২০০ কি.মি. ব্যাসল্টজাতীয় উপাদানে গঠিত বলে একে ব্যাসল্ট স্তর বলে। এর ঘনত্ব প্রায় ৮।

গুরুমণ্ডলের উপরের প্রথম ৬৫০ কি.মি. অঞ্চলকে বহির্গুরুমণ্ডল বা আপার ম্যান্টল বলে। তার নিচে অর্থাৎ ৬৫০ কি.মি. থেকে ২.৯২৫ কি.মি. পর্যন্ত অংশ অন্তর্গুরুমণ্ডল বা ইনার ম্যান্টাল নামে পরিচিত।

পৃথিবীর মোট আয়তনের ৮৩% ও ভরের ৬৭% গুরুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। গুরুমণ্ডলের নিম্নসীমা গুটেনবার্গ বিযুক্তি দিয়ে চিহ্নিত। প্রচণ্ড চাপে এ স্তরের উপাদানগুলো তরল ও কঠিন অবস্থায় মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে।

২.৫.৫. কেন্দ্রমণ্ডল বা কোর : পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে গুটেনবার্গ বিযুক্তি পর্যন্ত অঞ্চলটি কেন্দ্রমণ্ডল বা সেন্ট্রোস্ফিয়ার বা কোর (Core) নামে পরিচিত। রাসায়নিক পরিভাষায় গুরুমণ্ডলকে নাইফ (NIFE) বলা হয়। কারণ এখানে নিকেল (Ni) ও লোহা (Fe) [Ni+Fe = NIFE] র প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া এখানে পারদও পাওয়া যায়। ভূ-কম্পন তরঙ্গ থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রমণ্ডল দুটি অংশে বিভক্ত। বাইরের অংশ তরল এবং ভিতরের অংশ কঠিন অবস্থায় আছে বলে অনুমান করা হয়। কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশের মধ্য দিয়ে P-তরঙ্গ (longitudinal wave) ধীর গতিতে প্রবাহিত হয় কিন্তু জট্টতরঙ্গ প্রবেশ করতে পারে না। এতে প্রমাণিত হয় কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশ তরল অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রমণ্ডলের ধাতব প্রকৃতির উপরই পৃথিবীর চুম্বক বহুলাংশে নির্ভরশীল। কেন্দ্রমণ্ডলের ঘনত্ব ১০ থেকে ১৩.৬।

২.৬. বারিমণ্ডল

শিলামণ্ডলের যেসব নিচু অংশ পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে সাগর, মহাসাগর, হ্রদ, নদী ইত্যাদি জলভাগ গড়ে তুলেছে, সেই জলমগ্ন অঞ্চলগুলোকে একত্রে বারিমণ্ডল (hydrosphere) বলে। বারিমণ্ডল পৃথিবীর পরিবেশের অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

২.৬.১. বারিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য : পরিমণ্ডলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান

১) উত্তর গোলার্ধে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ বেশি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে জলরাশি অধিক।

২) সুমেরু বৃত্তের চতুর্দিকে স্থলভাগ বৃত্তাকারে অবস্থিত।

৩) স্থলভাগের পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃতি অপেক্ষা উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃতি অধিক।

৪) ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে জলভাগ তার বিপরীত অংশে স্থলভাগ এবং যে অংশে স্থলভাগ, তার বিপরীত অংশে জলভাগ।

২.৬.২. বারিমণ্ডলের উপাদান : বারিমণ্ডলের প্রধান উপাদান হলো পানি অর্থাৎ হাইড্রোজেন অক্সাইড বা H_2O। দুটি হাইড্রোজেন অণু ও একটি অক্সিজেন অণুর রাসায়নিক যৌগ মিলে পানি সৃষ্টি করে।

পানিতে দ্রবীভূত লবণের মাত্রা অনুসারে পানি মিষ্টি বা লোনা। পুকুর, নদী, খাল ও বিলের পানি মিষ্টি। সমুদ্রের পানি লোনা। কেননা, সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণের মাত্রা বেশি। এই লবণগুলোর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)-এর পরিমাণ সর্বাধিক।

সারণি ২.৩ : সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত লবণের মাত্রা

লবণ	রাসায়নিক সঙ্কেত	প্রতি ১০০০ গ্রাম পানিতে লবণের পরিমান (গ্রাম)
১. সোডিয়াম ক্লোরাইড	NaCI	২৩
২. ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড	$MgCI_2$	৫
৩. সোডিয়াম সালফেট	Na_2SO_4	৪
৪. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	$CaCl_2$	১
৫. পটাসিয়াম ক্লোরাইড	KCI	০.৭
সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত ৫টি লবণের মোট পরিমাণ		৩৩.৭%
অন্যান্য		০.৮%
দ্রবীভূত মোট লবণের পরিমাণ		৩৪.৫%

২.৬.৩. বারিমণ্ডলের পরিবেশগত গুরুত্ব : পৃথিবীর পরিবেশের সাথে বারিমণ্ডল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বারিমণ্ডল প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাগার। বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বারিমণ্ডলের তাৎপর্য অসীম। বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্পের গুরুত্ব অসীম। জলীয় বাষ্প লম্বা দৈর্ঘ্যের আলোকিত রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে। বারিমণ্ডল ছাড়া পানিচক্র (Lydrological cycle) অসম্পূর্ণ। বারিমণ্ডল ব্যতীত বাস্তুতন্ত্র অসম্পূর্ণ। বারিমণ্ডল জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ধারক ও বাহক। বারিমণ্ডল প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের উৎস যেমন মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ক্রিল (krill), ফার্ন (fern) প্রভৃতি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে বারিমণ্ডল থেকে আহরিত খাদ্য চিরাচরিত খাদ্যের সুষম বিকল্প হতে পারে বলে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সমুদ্রস্রোত, জোয়ার–ভাঁটা ও নদীর বহমান জলধারা জলবিদ্যুতের উৎস। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার যেভাবে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে চলেছে সেই প্রেক্ষিতে বারিমণ্ডল ভবিষ্যতে জ্বালানি সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। কারণ বারিমণ্ডল পুনর্ভব (renewable) শক্তির আধার। বারিমণ্ডল দূষণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। যেমন, কার্বন ডাই–অক্সাইড (CO_2), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) ইত্যাদি দূষিত গ্যাসগুলো সমুদ্রের পানিতে মিশে যায়।

২.৭. জীবমণ্ডল

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সমষ্টিকে জীবমণ্ডল (Biosphere) বলে। এটি জীব ও জীবনের ধারক ও বাহক। পৃথিবীর পানি, মাটি, বাতাস যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, তা জীবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। তবে জীবমণ্ডল যে শুধু সজীব উপাদান যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের যোগফলে গড়ে উঠেছে তাই নয় এখানে রয়েছে শক্তির প্রবাহ এবং পানি, মাটি বাতাস প্রভৃতি একাধিক জড় উপাদান। জীবমণ্ডলের মধ্যে এই বিভিন্ন সজীব, নির্জীব উপাদানগুলোর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া–বিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আর সে কারণেই জীবমণ্ডল এত বৈচিত্র্যময়।

জীবমণ্ডলের বিস্তৃতি মাটির গভীরে প্রায় ১০ মিটার, সমুদ্রের গভীরে ১০০ মিটার ও বায়ুমণ্ডলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার। বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবমণ্ডলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন

(ক) পেডোবায়োস্ফেয়ার (Pedobiosphere) বা স্থলভাগের জীবমণ্ডল এবং

(খ) হাইড্রোবায়োস্ফেয়ার (Hydrobiosphere) বা জলভাগের জীবমণ্ডল। স্থলভাগের জীবমণ্ডলে রয়েছে স্থলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। অন্যদিকে জলভাগের জীবমণ্ডলে রয়েছে জলজ উদ্ভিদ ও বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী। জীবমণ্ডল একাধিক বায়োম-এর সমন্বয়ে গঠিত। যেমন— ক্রান্তীয় অরণ্য বায়োম, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম, তুন্দ্রা বায়োম ইত্যাদি।

২.৭.১. পানিচক্র বা বারিচক্র (hydrological cycle) : বারিচক্র প্রাকৃতিক পরিবেশে জলের যোগান বা সরবরাহকে অক্ষুণ্ন রাখে। মাটির নিচে শিলাস্তরের মধ্যে যে মৃত্তিকা পানি (ground water) রয়েছে, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর জুড়ে যে জলভাগ রয়েছে, এমনকি বায়ুমণ্ডলে যে জলীয় বাষ্প রয়েছে, তার কোনটি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পানিচক্রের মাধ্যমে এরা প্রত্যেকে একটা বিরাট শক্তি প্রবাহের অংশ। পানিচক্র বা বারিচক্র না থাকলে পৃথিবীতে পানির যোগান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকতো।

যে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে পানি তার বিভিন্ন অবস্থায় শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল ও আবহ মণ্ডলের মধ্যে ক্রমাগত অপ্রতিহত অবস্থায় আবর্তিত হয়ে চলেছে, সেই চক্রাকার আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে পানিচক্র বা বারিচক্র বলে (hydrological cycle)।

২.৭.১.১. পানিচক্র বা বারিচক্রের বৈশিষ্ট্য : পানিচক্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান

১) পানিচক্রের কোনো শুরু বা শেষ নেই।

২) পানিচক্র হলো পরিবেশের মধ্যে পানির এক বিরামহীন, বিঘ্নহীন আবর্তন ব্যবস্থা, যার সাহায্যে পানি কখনও জলীয় বাষ্প, কখনও বিন্দু, কখনও বৃষ্টি হয়ে পরিবেশের মধ্যে নিরন্তর ঘুরে চলেছে।

৩) পানিচক্রের আর একটি বিশেষত্ব হলো স্থলভাগে যে পরিমাণ বাষ্পীভবন হয়, বৃষ্টিপাত তার চেয়ে বেশি হয়। আবার সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প যোগান দেওয়া হয়, বৃষ্টিপাত তার চেয়ে অনেক কম হয়।

৪) পানিচক্রের মাধ্যমে উদ্ভিদ জগত পানির যোগান পায় এবং প্রস্বেদনের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে পানির ভারসাম্য বজায় রাখে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রস্বেদনও বাষ্পীভবনের অন্যতম অংশ।

৫) পানিচক্রের গতি প্রকৃতি সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলে বন্যা বা খরা দেখা দেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জৈবিক পরিবেশ

Biological Environment

৩.১. জীবন

জীবন হলো কতগুলো লক্ষণের সমষ্টি। এই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো জীবের প্রোটোপ্লাজমের গঠন, চলন ও গমন (movement and locomotion), বিপাক (metabolism), জনন, বৃদ্ধি, উত্তেজনার প্রবণতা, বিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। জড় বা প্রাণহীন পদার্থের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণসমূহ দেখা যায় না। জীবনের মূলধারাটি জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ধরা রয়েছে। জড় পদার্থের কোনো জন্ম, মৃত্যু বা বার্ধক্য নেই।

জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বিভিন্ন খনিজ লবণ যার উৎসসমূহ হলো আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং পানি।

৩.১.১. জীবন সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

৩.১.১.১. প্রাণের উৎপত্তি

প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদ : প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি মতবাদ উল্লেখ করা হলো। তবে অধিকাংশ মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমানে এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কিছু নেই।

১. **বিশেষ সৃষ্টিবাদ** (Theory of special creation) : এই মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর সব জীবকে মহান আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। সব জীব পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় বিরাজ করছে। কোনো জীব হতে পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য জীব সৃষ্টি হয়নি।

২. **অজীব জনন তত্ত্ব** (Theory of spontaneous generation) : কোনো জৈব বস্তু বা জীবদেহ পচনের ফলে তার মধ্যে পোকা জন্মায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছিলেন, জড়বস্তু হতে জীবের উৎপত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে। যেমন কাদা হতে আপনা-আপনি ব্যাঙাচি জন্মায়, পচা কাপড় হতে ইঁদুর এবং পচা মাংশ হতে পোকা জন্মায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনেকেই ধারণা পোষণ করতেন এমনকি এরিস্টটলও তা বিশ্বাস

করতেন। কিন্তু ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে লুই পাস্তুর প্রমাণ করলেন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং কোনো জীবই আপনা–আপনি সৃষ্টি হয় না।

৩. **বিপর্যয়বাদ** (Theory of catastropism) : ভূ–তত্ত্ববিদ কুভিয়ার (Cuvier) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তার মতে, পৃথিবীতে অতীত হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এক এক যুগে এক একবার জীবের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধ্বংসও হয়েছে। পরবর্তী যুগে আবার নতুন করে জীবের সৃষ্টি হবে। একটি ধ্বংসের পর আপনা–আপনি আবার নুতন জীবের আবির্ভাব ঘটে। কুভিয়ারের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য হয়নি।

৪. **কসমোজোয়া মতবাদ** (Cosmozoa theory) : এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাণের বীজ (যা ব্যাকটেরিয়ার মত খুব ক্ষুদ্র ছিল) পৃথিবীর বাইরের কোনো গ্রহ থেকে উল্কা বা অন্যকিছুর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছিল। এ তত্ত্ব সমর্থিত হয়নি। কেননা যেসব জীবাণু পৃথিবীর তীব্র গরমে (যেমন— ফুটন্ত পানিতে) বেঁচে থাকে তারা কিন্তু অন্য গ্রহ হতে দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে আসার পথে সূর্যের অতিবেগুনিরশ্মির প্রভাবে মারা যাবে।

৫. **আধুনিক মতবাদ বা জীবের জৈব রাসায়নিক উদ্ভব** (Biochemical origin of life) : পৃথিবীর সব জীবই কোষ দিয়ে গঠিত এবং সব কোষের মৌলিক গঠনও এক। প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট এবং বিভিন্ন খনিজ মৌল ইত্যাদি উপাদান দিয়ে সব কোষ গঠিত। এ থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে, পৃথিবীর সব জীব একই কোষ থেকে উদ্ভুত।

বিবর্তনবিদ হেকেল আধুনিক মতবাদের প্রবর্তন করেন। হেকেলের মতে, পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল তা আদি পৃথিবীর বিশেষ পরিবেশে অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্রিয়া–বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজ্ঞানী হলডেন (Haldane), ওপারিন (Oparin), স্ট্যানলি মিলার (Stanley Miller), ইউরে (Uray), সিডনি ফক্স (Sydney Fox) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে হেকেলের সৃষ্টি রহস্য কিছুটা উন্মোচন করতে সমর্থ হন এবং তাঁরাও মনে করেন জীবনের সৃষ্টি কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ঘটেনি। পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়মে সমুদ্রের অগভীর পানিতে ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সৃষ্টি ও তাদের ক্রিয়া–বিক্রিয়ার ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধাপসমূহ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. প্রথম পর্যায় : অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় চারশত ষাট কোটি বছর পূর্বে এবং প্রাণের সৃষ্টির হয়েছে প্রায় তিনশত কোটি বছর পূর্বে। কাজেই একশত ষাট কোটি বছর লেগে যায় পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি পরিবেশ তৈরি হতে। পৃথিবীর উপরিভাগ তখনও উত্তপ্ত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শুধু জলীয় বাষ্প, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও মুক্ত হাইড্রোজেন ছিল বা বর্তমানে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনে দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলে তখন মুক্ত

অক্সিজেন ছিল না। উক্ত অজৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং বিভিন্ন জৈব অণুর সৃষ্টি হয়। যেমন অ্যামাইনো এসিড, সরল কার্বোহাইড্রেট, সরল ফ্যাটি এসিড এবং নিউক্লিক এসিড। এসব জৈব পদার্থ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় অতিবেগুনি রশ্মি (তখন অক্সিজেন না থাকায় ওজোন স্তরের সৃষ্টি হয়নি), বিদ্যুৎপ্রভা, মহাজাগতিক রশ্মি, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি। সমুদ্রের পানি ছিল তখন ফুটন্ত অবস্থায়। ফুটন্ত পানির মধ্যেই উক্ত অজৈব পদার্থসমূহের বিক্রিয়া ঘটেছিল।

মিলার ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর পরীক্ষা : আমেরিকার বিজ্ঞানী মিলার ১৯৫৩ সালে আদি পৃথিবীর পরিবেশ অনুযায়ী এক পাত্র তৈরি করলেন। পানি, এমোনিয়া, হাইড্রোজেন, মিথেন ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ পাত্রের মধ্যে রাখা হলো । এই গ্যাসীয় মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ৮০° সে. উষ্ণতায় এক সপ্তাহ ধরে ৬০,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎক্ষরণ চালনা করা হলো। এরপর পাত্রের তরল পরীক্ষা করে বেশ কিছু জৈব পদার্থ পাওয়া গেল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্লাইসিন, এলানিন ইত্যাদিসহ প্রায় দশটি অ্যামাইনো এসিড। তাছাড়া ছিল হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) এবং বিভিন্ন প্রকার এলডিহাইড। এ সমস্ত জৈব যৌগসমূহ প্রাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান।

মিলারের পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অজৈব পদার্থ সংমিশ্রণ করে আরও অনেক জৈব পদার্থ সংশ্লেষে সমর্থ হন। এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, অতীতে পৃথিবীর হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ পরিবেশে অ্যামাইনো এসিড ও অন্যান্য সরল জৈব অণু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। সমুদ্রের অগভীর পানিতে এই পদার্থগুলো মিশে ছিল। ফলে এই পানি হয়ে উঠেছিল অনেকটা সুপের মতো। এই গরম পাতলা সুপই ছিল প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক ক্ষেত্র।

খ. দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ জৈব অণুর সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পানি বিয়োজনের মাধ্যমে কনডেনসেশন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অণু যুক্ত হয়েছিল। প্রথমেই প্রোটিন অণুর কথা বলা যাক্। দীর্ঘ একটি শৃঙ্খলে অ্যামাইনো এসিড পরপর যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় প্রোটিন অণুর। সিডনি ফক্স ১৯৫৭ সালে প্রায় ১৮টি অ্যামাইনো এসিডের মিশ্রণকে ১৬০–২০০° সে. উষ্ণতায় রাখার পর শীতল করেন। শীতল করার পর দেখলেন অ্যামাইনো এসিড পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (প্রোটিন) অণু গঠন করেছে। তিনি এই প্রোটিন অণুর নাম দেন প্রোটিনয়েড (protenoids)। আদি পৃথিবীতে উচ্চ উষ্ণতায় এ ধরনের প্রোটিন অণু তৈরি হয়েছিল।

নিউক্লিক এসিডের সৃষ্টি : প্রাণ সৃষ্টির জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নিউক্লিক এসিড। নিউক্লিক এসিডের জন্য প্রয়োজন শর্করা, ফস্‌ফেট ও নাইট্রোজেন গঠিত ক্ষার। বিজ্ঞানী মিলারের পরীক্ষায় হাইড্রোজেন সায়ানাইড গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য করেছেন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড হতে এডেনিন ও ইউরাসিল পাওয়া যায়। এডেনিন ও ইউরাসিল হচ্ছে নিউক্লিক এসিডের ক্ষার। নিউক্লিক এসিডের অন্যান্য ক্ষারও পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল। নিউক্লিক এসিডের অপর উপাদান হলো রাইবোজ বা

ডি–অক্সিরাইবোজ– জাতীয় শর্করা। ফরমালডিহাইড জলীয় দ্রবণে উপযুক্ত পরিবেশে ঘনীভূত হয়ে সরল শর্করা গঠন করে। আদি সমুদ্রে এই প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপাদনের খুবই সম্ভাবনা ছিল। শর্করা, ফস্‌ফেট ও ক্ষার একত্রে যুক্ত হলেই গঠিত হয় নিউক্লিওটাইড, যা কিনা নিউক্লিক এসিডের একক। নিউক্লিওটাইডসমূহ পানি বিয়োজনের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে গঠন করে আরএনএ (RNA) ও ডিএনএ (DNA)।

লিপিডের সৃষ্টি : আর একটি উপাদান হলো লিপিড। ফরমালডিহাইড, ফরমিক এসিড ও সরল শর্করা হতে লিপিড তৈরি সম্ভব এবং সম্ভবত তাই হয়েছিল।

গ. তৃতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পর্যায়ে কনডেনসেশন প্রক্রিয়ায় যে বৃহৎ জৈব অণু উৎপন্ন হয়েছিল এই পর্যায়ে পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় বৃহৎ অণুসমূহ একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করল আরও বৃহদাকার জটিল অণু যা জীবন সৃষ্টির পথকে আরও সুগম করেছিল।

কোয়াসারভেট ফোঁটা (Coacervate droplets) বা মাইক্রোস্ফেয়ার বৃহৎ অণুগুলো সমুদ্রের পানিতে সুপের মতো ছিল, যার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন বিন্দু। ওপারিন এদের নাম দেন কোয়াসারভেট এবং ফক্স নাম দেন মাইক্রোস্ফিয়ার। ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এসব প্রোটিন বিন্দুর সাথে অবশেষে যুক্ত হয় (RNA) শর্করা, (ATP) ও লিপিড এবং ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক সময় সঞ্চার হয় প্রাণের। এরা আদি সজীব বস্তুরূপে গণ্য হয়। মাইক্রোপ্লাজমা এরূপ এক প্রকার সরল এককোষী আদি প্রকৃতির জীব।

জৈব বিবর্তন : জীবন সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকে সরল জীব হতে ধীরে ধীরে যে জটিল ধারায় পৃথিবীতে বিভিন্ন জীবের আবির্ভাব ঘটেছে, তাকে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন বলে। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া তাই সর্বদা ক্রিয়াশীল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদি সমুদ্রে এক ধরনের প্রলম্বিত প্রোটিন বিন্দু উৎপন্ন হয়েছিল। মাইক্রোস্ফেয়ার নামে অভিহিত এই বিন্দুগুলোর মধ্যেই প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়।

প্রাণ সৃষ্টির পর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি চলতে থাকে। এদের জন্য অনেক বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ফলে সমুদ্রের জৈবকণা সমৃদ্ধ সুপ হতে খাদ্য আহরণ করতে করতে এক সময় খাদ্যের টান পড়ে। ফলস্বরূপ এদের টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। অপেক্ষাকৃত সবলেরা সম্ভবত দুর্বলদের আত্মসাৎ করে। অবশেষে যাদের বিপাকক্রিয়া, এনজাইম ব্যবস্থা এবং অধিক দ্রুত বংশবিস্তার ক্ষমতা ইত্যাদি সবচেয়ে উন্নত হয় তারাই প্রকৃতি দ্বারা নির্বাচিত হয় অর্থাৎ জয়ী হয়। এই অবস্থা কোটি কোটি বছর চলতে থাকে। খাদ্যের অভাবজনিত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একদল ক্লোরোফিলের উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করেছিল এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজদেহে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে আদি বায়ুমণ্ডলে কোনো মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। তাই আদি জীবনকণা ছিল বায়ুজীবী। সালোকসংশ্লেষণ শুরু হওয়ার পরই প্রথম অক্সিজেন উৎপন্ন হতে শুরু করে। এই সব সালোকসংশ্লেষণকারী আদি জীবকণা সম্ভবত ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় আয়তনবিশিষ্ট ছিল।

পরিবেশে অক্সিজেনের আবির্ভাবের ফলে কিছু কিছু জীব সবাত শ্বসনের ক্ষমতা অর্জন করে। ক্লোরোফিলযুক্ত সবাত শ্বসনকারী জীবকণা পরিণত হয় এককোষী উদ্ভিদে (শৈবাল) এবং ক্লোরোফিলবিহীন সবাত শ্বসনকারী জীব পরিণত হলো প্রাণীতে। মাঝামাঝি কিছু জীব যারা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও ক্লোরোফিল উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি, তারা হলো ছত্রাক। স্বভোজী উদ্ভিদ ও পরভোজী প্রাণী পাশাপাশি অবস্থান করে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল।

উদ্ভিদের বিবর্তন : প্রথমে এককোষী উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে একদলের ক্লোরোফিল ছিল তারা শৈবাল নামে পরিচিত। যাদের ক্লোরোফিল নেই তারা ছত্রাক নামে পরিচিত। আদি শৈবাল ও ছত্রাক ধীরে ধীরে বহুকোষী শৈবাল ও ছত্রাকে পরিণত হয়। এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়, এরা সমাঙ্গদেহী। সংবহন কলাবিহীন উভচর উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যাদের ব্রায়োফাইটা বা মসবর্গের উদ্ভিদ বলা হয়। এরপর সংবহনকলাযুক্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যাদের প্রকৃত মূল, কাণ্ড ও পাতা ছিল। এদের টেরিডোফাইটা বা ফার্নবর্গের উদ্ভিদ বলা হয়। বিবর্তনের ধারায় প্রতিষ্ঠিত এরাই প্রথম স্থলজ উদ্ভিদ। ক্রমে সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। পাইনজাতীয় উদ্ভিদেরা সপুষ্পক হলেও, এদের শুধু বীজ হয়, ফল গঠিত হয় না। তাই এগুলোকে ব্যক্তজীবী উদ্ভিদ বলে। গুপ্তজীবী উদ্ভিদ সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের। এগুলোর বীজ ফলের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদ দুই প্রকার। যথা— একবীজপত্রী উদ্ভিদ যেমন, ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, সুপারি, ধান, নারিকেল, তাল ইত্যাদি এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি উদ্ভিদ।

প্রাণীর বিবর্তন : প্রথম সৃষ্ট প্রাণীও এককোষী ছিল। এককোষী প্রাণীরা প্রোটোজোয়া পর্বের অন্তর্গত। এদের থেকে স্পঞ্জজাতীয় (পরিফেরা) বহুকোষী প্রাণীর উৎপত্তি হয় কিন্তু এরা তখনও নিজেদের দেহে সুগঠিত কলা গঠন করতে পারেনি। নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের প্রথম সুগঠিত কলার সৃষ্টি হয়। এরপর ধীরে ধীরে টিনোফেরা, কৃমিজাতীয় প্রাণী, অঙ্গুরীমাল প্রাণী, আর্থোপোডা, মোলাস্কা, একাইনোডারমাটা ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পর মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে প্রথম আবির্ভাব ঘটে চোয়ালবিহীন জলজ মৎস্যজাতীয় প্রাণীর যারা অ্যাগনাথা অধিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরপর চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী যার মধ্যে প্রথম আবির্ভাব ঘটে তরুণাস্থিযুক্ত মাছের। এরপর ধীরে ধীরে অস্থিযুক্ত মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী উভয়ই সরীসৃপ হতে উৎপন্ন হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষের আবির্ভাব সবচেয়ে পরে।

৩.২. জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ এই বিশ্ব মহাজগতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কারণ জীবনের উদ্ভবের জন্য যে উপাদানসমূহ একান্ত দরকার, তার অস্তিত্ব পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও নেই।

সারণি ৩.১ : ভূ-তাত্ত্বিক কাল ও প্রাণের বিকাশ

কল্প বা যুগ (ERA)	উপকল্প বা উপযুগ (Period)	অবকল্প বা অধিযুগ (Epoch)	শুরুর প্রাচীনত্ব (কোটি বছরে) ও তাপমাত্রা	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (প্রাণী ও উদ্ভিদ)	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (প্রাকৃতিক)
নব্যশীবীয় বা সেনোজোয়িক (Cenozoic)	কোআর্টানারি (Quaternary)	হলোসিন (Holocene)	০.০০১ বর্তমান	লৌহযুগ, আধুনিক মানুষ	
		প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)	০.২ ঠাণ্ডা থেকে তুষারবৃত	হোমোসেপিয়ান মানুষ, শেষ হিমযুগ	
	টার্সিয়ারি (Tertiary)	প্লায়োসিন (Pliocene)	০.৭ ঠাণ্ডা	আদিম মানুষ, আদিম অস্ত্র তৈরি করার পদ্ধতির আবিষ্কার	
		মায়োসিন (Miocene)	২.৬ বর্তমান	মনুষ্যতর প্রাণী (রামাপিথিকাস) (বৃক্ষবাসী মানুষ)	আলার উৎস
		অলিগোসিন (Oligocene)	৩.৮ গরম থেকে মধ্যম	গরিলা	পিরিনিজ পর্বত
		ইওসিন (Eocene)	৫.৪ গরম থেকে মধ্যম	শিম্পাঞ্জি	হিমালয়ের উৎপত্তি
		প্যালিওসিন (Paleocene)	৬.৫ মধ্যম	উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব	টেথিস সাগরের সংকোচন
মধ্যজীবীয় বা মেসো-জোয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেশাস (Cretaceous)		১৩.৫ মধ্যম থেকে আর্দ্র	সপুষ্পক গাছের আবির্ভাব	গান্ডোয়াল্যান্ডের ভাঙ্গন
	জুরাসিক (Jurassic)		১৯.৫ গরম থেকে শুষ্ক	উভচরের সংখ্যা হ্রাস, ডায়ানোসরের বিলুপ্তি, পাখির আবির্ভাব	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		২২.৫ গরম থেকে	নগ্নবীজী উদ্ভিদ, কুমীর, কচ্ছপের উদ্ভব	
পুরাজীবীয় বা প্যালিওজোয়িক (Paleozoic)	পার্মিয়ান (Permian)		২৮.০ মধ্যম থেকে সাধারণ	পাইন, ফার্নজাতীয় গাছের উদ্ভব, জলবায়ুর পরিবর্তন	

কল্প বা যুগ (ERA)	উপকল্প বা উপযুগ (Period)	অবকল্প বা অধিযুগ (Epoch)	শুরুর প্রাচীনত্ব (কোটি বছরে) ও তাপমাত্রা	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (প্রাণী ও উদ্ভিদ)	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (প্রাকৃতিক)
	কার্বনিফেরাস (Corbonife rous)		৩৪.৫ তুষারাবৃত থেকে গরম শেষ পর্যায়ে	কয়লার উদ্ভব, প্রথম সরীসৃপ	ভারতীয় উপমহাদেশের উপরাংশ বরফাচ্ছন্ন
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		৩৯.৫ গরম থেকে মধ্যম	বিভিন্ন ধরনের মাছের উদ্ভব	
	সিলুরিয়ান (Silurian)		৪৩.৫ উষ্ণ	প্রাণের পূর্ণ বিকাশ, বড় গাছ ও মেরুদণ্ডী মাছের উদ্ভব	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		৫০.০ মধ্যম থেকে উষ্ণ	প্রথম মেরুদণ্ডী জীব	
	ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)		৫৭.০ ঠাণ্ডা থেকে মধ্যম	সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব	ভিনদয়ান পর্বতের উৎপত্তি
উষ্ণজীবীয় বা প্রোটেরোজোয়িক (Proterozoic)			২৫০ শেষ পর্যায়ে ঠাণ্ডা	পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি, অতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি	আরাভাল্লি পর্বতের উৎপত্তি
আর্কিয়ান (Archean)			৪০০	ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব, আদিম বায়ুমণ্ডল– মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য	
হেডিয়ান (Hadean)			৪৫০ কোটি বছরের বেশি	প্রাচীনতম শিলা, প্রাণহীন পৃথিবীর আদি অবস্থা	

উল্লেখিত সারণিতে ভূ-তাত্ত্বিক কাল অনুসারে পৃথিবীর প্রাণহীন আদি, উষ্ণ, গ্যাসীয় অবস্থা থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভব হলো, জীবের বিকাশ ঘটল, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সারণি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রাণের উদ্ভবপর্ব থেকে আধুনিক মানুষের আগমন একটি নিরন্তর বিবর্তনের ফসল।

পৃথিবীর আদিমতম অবস্থা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের দৈর্ঘ্যকে ভূ-তাত্ত্বিক কাল (geological time) বলে। ভূ-তাত্ত্বিক কালের পরিসর ৪৫০ কোটি বছরের কিছু আগে ভূ-গোলকের আকার ধারণ করে।

দীর্ঘ সময়কে যুগ বা কল্পে (Era) বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাচীনতম যুগ থেকে আধুনিকতম যুগ পর্যন্ত এই কল্পগুলো হলো (১) হেডিয়ান (Hadean), (২) আর্কিয়ান (Archean), (৩) ঊষাজীবীয় বা প্রোটেরোজোয়িক (Proterozoic), (৪) পুরাজীবীয় বা প্যালিওজোয়িক (Paleozoic), (৫) মধ্যজীবীয় বা মেসোজোয়িক (Mesozoic) এবং (৬) নব্যজীবীয় বা সেনোজোয়িক (Cenozoic) এই ছয়টি বিভিন্ন যুগে সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—

১. **হেডিয়ান :** এই পর্বের মেয়াদ ৫০ কোটি বছরের কিছু বেশি। আজ থেকে ৪০০–৫০০ কোটি বছর আগে এই যুগ এসেছিল। এই সময়ে পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি বা উদ্ভবের মতো কোনো পরিবেশ ছিল না। পৃথিবী এই সময়ে ভূ-গোলকে পরিণত হলেও আজকের দিনে যেমন পাহাড় পর্বত, নদী–নালা, ঝড়–বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন লক্ষণগুলো দেখা যায়, সে ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য সে পৃথিবীর ছিল না।

২. **আর্কিয়ান :** এই যুগের ব্যাপ্তি ১৫০ কোটি বছর। আজ থেকে ২৫০ থেকে ৪০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আর্কিয়ান যুগ এসেছে। বায়ুমণ্ডলে এই সময়ে প্রচুর হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, জল, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যেত। চুনাপাথরের অবক্ষেপ থেকে এই যুগে স্ট্রোমাটোলাইট এর উদ্ভব ঘটে। এছাড়া আর্কিয়ান যুগে ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব হয়েছিল বলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

৩. **ঊষাজীবীয় বা প্রোটেরোজোয়িক :** এই যুগের ব্যাপ্তি ১৯৩ কোটি বছর। আজ থেকে ৫৭–২৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এই যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে আদিম উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু করে। ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এককোষী প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে তাপমাত্রা ছিল ঠাণ্ডা। উপমহাদেশে সৃষ্টি হয় কুভাডা, ভিনদয়ান এবং আরাবালী পর্বতের উৎপত্তি হয়।

৪. **পুরাজীবীয় বা প্যালিওজোয়িক :** এ যুগের ব্যাপ্তি ৩৪.৫ কোটি বছর। আজ থেকে ২২.৫–৫৭ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্যালিওজোয়িক যুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো যে, এই সময়ে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব হয়। সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী, প্রথম মেরুদণ্ডী জীব, প্রবাল, বড় গাছ, প্রথম সরীসৃপ ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশে এই যুগটি সমৃদ্ধ।

পুরাজীবীয় বা প্যালিওজোয়িক যুগকে ছয়টি উপযুগ বা পিরিয়ড–এ বিভক্ত করা হয়। প্রাচীনতার ক্রম অনুসারে এই উপযুগগুলো হল :

ক. **ক্যামব্রিয়ান** (Cambrian) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো — (১) সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্ম হয়। (যেমন— একাইনোডার্ম, ব্র্যাকিওপড ইত্যাদি), (খ) প্রাণীদেহে শক্ত খোলা বা খোলকের আবির্ভাব ঘটে। যেমন— চিংড়ি, শামুক ইত্যাদি, (গ) এছাড়া স্পঞ্জ, চ্যাপটা

কৃমি, প্রচুর জলজ উদ্ভিদও এই সময় জন্মায়, (ঘ) এই উপযুগে অশ্বক্ষুর কাঁকড়ার আদিপুরুষ ট্রাইলোবাইট নামক সন্ধিপদ প্রাণীর বিকাশ ঘটে। তাপমাত্রা ঠাণ্ডা হতে মধ্যম পর্যায়ের ছিল। ভারতে ভিনদয়ান (Vindyan) পর্বতের উৎপত্তি। ক্যামব্রিয়া উপযুগের মেয়াদ সাত কোটি বছর (৫০–৫৭ কোটি বছর)।

খ. **অর্ডোভিসিয়ান** (Ordovician) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো (১) এই সময়ে প্রথম মেরুদণ্ডী জীবের বিকাশ ঘটে, (২) স্থলভাগে শ্যাওলা জন্মাতে শুরু করে, (৩) মাটির উৎপত্তি শুরু হয়, (৪) ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিকারী প্রাণীর বিকাশ হয়, (৫) সামুদ্রিক পরিবেশে প্রবাল সৃষ্টি হয়, (৬) জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণী মারা যায়। তাপমাত্রা মধ্যম মাত্রা থেকে উষ্ণ পর্যায়ের ছিল।

গ. **সিলুরিয়ান** (Silurian) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো (১) এই উপযুগে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। স্থলভাগে প্রথম সন্ধিপদ প্রাণীর (Arthropod) প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, (২) বড় গাছ বা বৃক্ষের উদ্ভব শুরু হয়, (৩) প্রথম মেরুদণ্ডী মাছের উদ্ভব হয়, (৪) ডানাযুক্ত পোকা-মাকড়ের জন্ম হয়। তাপমাত্রা উষ্ণ পর্যায়ের ছিল। এই উপযুগের মেয়াদ ৪ কোটি বছর (৩৯.৫–৪৩.৫ কোটি বছর)।

ঘ. **ডেভনিয়ান** (Devonian) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো (১) বিভিন্ন ধরনের মাছের উদ্ভব হয়। তাই মৎস্য যুগ বলে, (২) সমুদ্রে হাঙরের উদ্ভব হয়, (৩) স্থলভাগে উভচর গোষ্ঠীর প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যায়— ব্যাঙ, গিরগিটি ইত্যাদি, (৪) প্রবল ভূ-আন্দোলনের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে পবর্তমালার সৃষ্টি হয়।

এই উপযুগের মেয়াদ হলো ৫ কোটি বছর (৩৪.৫–৩৯.৫ কোটি বছর)। তাপমাত্রা উষ্ণ থেকে মধ্যম পর্যায়ের

ঙ. **কার্বনিফেরাস** (Carboniferous) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

(১) এটি জলাভূমি ও কয়লার যুগ। এই সময়ে কয়লার উদ্ভব হয়। ক্যালামাইটিস (Calamities) প্রজাতির অতিকায় গাছগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ে এই উপযুগে কয়লায় পরিণত হয়েছিল।

(২) কার্বনিফেরাস উপযুগে প্রথম সরীসৃপ দেখা যায়।

(৩) স্থলভাগের আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে প্রচুর ফার্ন জন্মায় (যেমন— গ্লসপ্টেরিস)। আলোচ্য উপযুগের মেয়াদ হলো — ৬.৫ (২৮–৩৪.৫) কোটি বছর। প্রথম দিকে হিমবাহ পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

চ. **পার্মিয়ান** (Permian) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো —

(১) পাইন, ফার, স্প্রুসজাতীয় সরলবর্গীয় কনিফার শ্রেণীর বৃক্ষের উদ্ভব হয়।

(২) মেসোসরাস নামক সরীসৃপ আধিপত্য বিস্তার করে।

(৩) দক্ষিণ গোলার্ধে হিমবাহের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

(৪) সাধারণভাবে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জলবায়ু উষ্ণ–আর্দ্র থেকে শীতল–শুষ্ক হয়ে উঠে।

(৫) বড় বড় জলাভূমি শুকিয়ে যেতে শুরু করে। তাপমাত্রা মাধ্যম পর্যায় থেকে সাধারণ মাত্রায় ছিল।

৫. **মধ্যজীবীয় বা মেসোজোয়িক** (Mesozoic) : এই যুগের ব্যাপ্তি ১৬ কোটি বছর। আজ থেকে ৬.৫–২২.৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মধ্যজীবীয় বা মেসোজোয়িক যুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের অন্যতম অবদান হলো যে, এই সময়ে জীবজগতের মধ্যে ব্যাপক বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে।

মেসোজোয়িক যুগের তিনটি উপযুগ আছে। যেমন— (ক) ট্রায়াসিক (Triassic), (খ) জুরাসিক (Jurassic), এবং (গ) ক্রিটেশাস (Cretaceous)।

(ক) ট্রায়াসিক : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশগুলো ভেঙে একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে এবং সমুদ্র ও মহাদেশ তার বর্তমান আকৃতি ধারণ করতে থাকে।

(২) কচ্ছপ, গিরগিটি, ডায়ানোসোরের উদ্ভব হয়।

(৩) নগ্নজীবী উদ্ভিদের বিকাশ ঘটে (এদের বীজ ফলের মধ্যে না থেকে, বাইরের দিকে থাকে। যেমন— সাইকাস) এই উপযুগের মেয়াদ তিন কোটি বছর (১৯.৫–২২.৫ কোটি বছর আগে)। তাপমাত্রা উষ্ণ থেকে শুষ্ক পর্যায়ের।

(খ) জুরাসিক (Jurassic) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) ডায়নোসর বিলুপ্ত হয়। এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে, ভূ–আলোড়নের প্রভাবে এবং উল্কার আঘাতে বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তিত হয়। ফলে সমস্ত ডায়নোসর পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

(২) দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের উৎপত্তি হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে জীবজন্তুর অবাধ বিচরণ করার সুযোগ নষ্ট হয়। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বা বায়োম গঠিত হয়।

(৩) পাখির প্রথম উদ্ভব হয়। তাপমাত্রা উষ্ণ থেকে শুষ্ক পর্যায়ের।

এই উপযুগের মেয়াদ ৬ কোটি বছর (১৩.৫–১৯.৫ কোটি বছর আগে)

(গ) **ক্রিটেসিয়াস** (Cretaceous) : জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই উপযুগের প্রধান অবদান হলো—

(১) সপুষ্পক উদ্ভিদ বা ফুল ফোটাতে পারে এমন গাছের আবির্ভাব হয়।

(২) উভচর প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

(৩) প্রচণ্ড উল্কাপাতের ফলে জীবজগতের ক্ষতি হয়। আঞ্চলিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। এই উপযুগের মেয়াদ ৭ কোটি বছর (৬.৫–১৩.৫ কোটি বছর আগে)। তাপমাত্রা মধ্যম থেকে আর্দ্র পর্যায়ের।

৬. **নব্যজীবীয় বা সেনোজোয়িক** (Cenozoic) : এই যুগের ব্যাপ্তি ৬.৫ কোটি বছর। বর্তমানকাল থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর পিছিয়ে গেলে যে সময়টি পাওয়া যায়, তাকেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় সেনোজোয়িক বা নব্যজীবীয় যুগ বলে। এই যুগের অন্যতম অবদান হলো যে, এই সময়ে প্রাণীজগতের মধ্যে ব্যাপক বিবর্তনের ফলে মানুষের উৎপত্তি হয়। জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই প্রাণী। পৃথিবীর বাইরে আমাদের জানা আর কোনো গ্রহে মানুষের মতো জীবের অস্তিত্ব নেই। তাই মানুষ হলো বিবর্তনের অভূতপূর্ব ফসল।

সেনোজোয়িক যুগকে দুটি উপযুগে ভাগ করা যায়, যেমন— টার্সিয়ারি (tertiary) এবং কোয়াটার্নারি (quaternary)।

কোয়ার্টার্নারি উপযুগকে আবার দুটি অধিযুগ বা অবকল্পে (Epoch) বিভক্ত করা যায়, যেমন— হলোসিন (Holocene) এবং প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)।

অন্যদিকে টার্সিয়ারি উপযুগের মধ্যে অধিযুগের সংখ্যা হলো পাঁচ যথা— (১) প্যালিয়োসিন (Paleocene), (২) ইয়োসিন (Eocene), (৩) অলিগোসিন (Oligocene), (৪) মায়োসিন (Miocene), (৫) প্লায়োসিন (Pliocene)।

(১) **টার্সিয়ারি উপযুগ :** এই উপযুগের অন্তর্গত প্রাচীনতম অধিযুগ বা অবকল্প হলো প্যালিওসিন।

(২) **প্যালিওসিন :** জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই অধিযুগের অসামান্য অবদান রয়েছে। যেমন—

- এই সময় থেকেই প্রথম উচ্চ শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী জন্মাতে থাকে।
- নগ্নজীবী উদ্ভিদরা বিলুপ্ত হয়ে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বিকাশ ঘটতে থাকে।

এই অধিযুগের মেয়াদ ১ কোটি ১০ লক্ষ বছর (৫.৪–৬.৫ কোটি বছর আগে) তাপমাত্রা মধ্যম পর্যায়ের। টেথিস সাগর সংকুচিত হতে থাকে।

(৩) **ইয়োসিন :** প্যালিওসিনের পরে ইয়োসিন হলো টার্সিয়ারি উপযুগের দ্বিতীয় প্রাচীনতম যুগ। জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই অধিযুগের মূল বৈশিষ্ট্য হলো যে, এই সময়ে

- ❑ ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিবর্তে আকারে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।
- ❑ হাতি ও ঘোড়ার মধ্যে ব্যাপক বিবর্তন ঘটে।
- ❑ উটের মধ্যে বিবর্তনের গতি কমে আসে।

এই অধিযুগের মেয়াদ ১ কোটি ৬০ লক্ষ বছর (৩.৮—৫.৪ কোটি বছর আগে) তাপমাত্রা মধ্যম থেকে উষ্ণ পর্যায়ের। হিমালয় পর্বতমালার উৎপত্তি।

(৪) **অলিগোসিন :** জীবনের বিকাশ অলিগোসিন অধিযুগে একটি জটিল পথ ধরে। এই সময়ে বানর ও বনমানুষ অর্থাৎ মনুর্ষত্যের প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। মিশরের শিলাস্তরে এই ধরনের প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ইজিপ্টোপিথিকাস। এরা গাছে বসবাস করতো। গাছের পাতা, ফল মূলই ছিল এদের প্রধান খাদ্য।

এই অধিযুগের মেয়াদ ১ কোটি ২০ লক্ষ বছর (২.৬—৩.৮ কোটি বছর আগে)। তাপমাত্রা উষ্ণ থেকে মধ্যম পর্যায়ের। পিরিনিজ পর্বতের উৎপত্তি।

(৫) **মায়োসিন :** মায়োসিন অধিযুগের ব্যাপ্তি ১ কোটি ৯০ লক্ষ বছর (৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ বছর আগে)। এই সময়ে মনুষ্য প্রাণীর মধ্যে দ্রুত বিবর্তন ঘটতে থাকে এবং আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ রামাপিথিকাস (Ramapithecus) প্রজাতি প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। ভারতে চণ্ডীগড়ের কাছে শিবালিক পাহাড়ে রামাপিথিকাসের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাপমাত্রা মধ্যম পর্যায়ের। আল্‌পস পর্বতের সৃষ্টি।

(৬) **প্লায়োসিন :** মায়োসিন অধিযুগের শেষে প্লায়োসিন অধিযুগ শুরু হয়। এই পর্বের মেয়াদ ছিল ৫০ লক্ষ বছর (২০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ বছর আগে) জীবনের বিকাশ প্লায়োসিন অধিযুগে থেমে থাকেনি। রামাপিথিকাস থেকে আধুনিক মানুষ তৈরি হওয়ার পথে পৃথিবী আরও একধাপ এগিয়ে যায়। এই সময়ে যে আদি মানুষের উদ্ভব হয় তার নাম হলো অস্ট্রালোপিথিকাস আফ্রিকানাস *Australopithecus africanus*। এরা শিকার করার জন্য ভোঁতা হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল। অর্থাৎ তৃণভোজী থেকে মানুষ এই পর্বে ধীরে ধীরে সর্বভূক প্রাণীতে পরিণত হয়। এর ফলে খাদ্যশৃঙ্খল ও

খাদ্যজালিকায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাস্তুতন্ত্রের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ও সুদুর প্রসারী। তাপমাত্রা ছিল ঠাণ্ডা পর্যায়ের। অ্যান্ডিজ পর্বতের উৎপত্তি এময়েই হয়। প্লায়োসিন অধিযুগে টার্সিয়ারি উপযুগ শেষ হয়। এরপর আসে কোয়ার্টার্নারি উপযুগ।

(১) **কোয়ার্টার্নারি উপযুগ** : এই উপযুগের মেয়াদ ২০ লক্ষ বছর। এই পর্বে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটে। কোয়ার্টানারির দুটি অধিযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

(২) **প্লাইস্টোসিন :** আলোচ্য অধিযুগের ব্যাপ্তি ১৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর অর্থাৎ ১০ হাজার থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে প্লাইস্টোসিন অধিযুগের আবির্ভাব হয়। জীবনের বিকাশ প্রসঙ্গে এই পর্বের অবদান হলো যে, এই সময়ে—

- ❑ মনুষ্য প্রজাতির উদ্ভব হয়। এই মনুষ্য প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম *Homosapiens sapiens*।
- ❑ জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হয় ও শেষ হিমযুগ আসে।

(৩) **হলোসিন :** এই অধিযুগের ব্যাপ্তি আজ থেকে ৬০ হাজার বছর। এটি লৌহ বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের যুগ। নগরায়ন ও বিশ্বায়নের যুগ। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের যুগ। পরিবেশ দূষনের যুগ।

৩.৩. প্রাকৃতিক আবাসভূমি ও জৈবিক পরিবেশ

পৃথিবীর যে স্থানে অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে কোনো একটি জীব বা জীবগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে, দল বেঁধে বসবাস করে, তাকে প্রাকৃতিক আবাসভূমি (habitat) বলে। যেমন, কাঁটাজাতীয় গাছের প্রাকৃতিক বাসভূমি হল উষ্ণ মরুভূমি, পেঙ্গুইনের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল, তিমি মাছের জন্য সমুদ্র ইত্যাদি।

পরিবেশের সাথে প্রাকৃতিক বাসভূমির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। অনুকূল পরিবেশ ছাড়া কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী বা কোন মানুষ পৃথিবীর কোথাও সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে দলবেঁধে বসবাস করতে পারে না। অনুকূল পরিবেশ না পেলে তাদের পক্ষে সেখানে বংশ পরম্পরায় জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। তাই পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বাসভূমি হলো অবিভাজ্য। এর প্রধান কারণ হলো। আর প্রাকৃতিক বাসভূমি হলো ফল বা পরিণাম।

পরিবেশ কিভাবে প্রাকৃতিক বাসভূমি গড়ে তোলে তার কয়েকটা উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো। যেমন—

(ক) ভিজে, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে প্রাকৃতিক পরিবেশ—শৈবালের বাসভূমি।

(খ) স্থলভাগ—মানুষের বাসভূমি

(গ) সমুদ্রের লবণাক্ত পরিবেশ—তিমি মাছের বাসভূমি ইত্যাদি।

বাস্তুতন্ত্র অনুসারে প্রাকৃতিক আবাসভূমি চার ধরনের যথা—

(ক) মিষ্টি বা সুপের জলের প্রাকৃতিক বাসভূমি

(খ) সামুদ্রিক এলাকার প্রাকৃতিক বাসভূমি

(গ) মোহনা অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবাসভূমি,

(ঘ) স্থলভাগের প্রাকৃতিক বাসভূমি।

সুপের বা মিষ্টি জলের প্রাকৃতিক (Fresh water Rabitat) আবাসভূমি দুই ধরনের যথা—

(১) আবদ্ধ জলের প্রাকৃতিক আবাসভূমি বা (lentic habitat)। যেমন— হ্রদ, জলাভূমি, পুকুর।

(২) মুক্ত জলের প্রাকৃতিক আবাসভূমি বা (liotic habitat)। যেমন— নদী, ঝর্ণা ইত্যাদি।

খাদ্য শৃঙ্খল অনুসারে এখানে তিন ধরনের জীবের দেখা পাওয়া যায়। যেমন— উৎপাদক গোষ্ঠীতে জলজ উদ্ভিদ, খাদক স্তরে মাছ, শুশুক ইত্যাদি ফ্যাগোট্রফ (phagotrophs), বিয়োজক স্তরে অণুজীবীরা স্যাপ্রোট্রক (saprotrophs)।

বসবাসের এলাকা অনুসারে এই পরিবেশে তিন ধরনের জীব থাকে। যেমন— পানির খুব গভীরে কম অক্সিজেনে ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, অ্যানিলিড, উপরের স্তরে মাছ, শামুক, প্লাংকটন এবং পাড় বা পাড়ের কাছে শিকড়ওলা জলজ উদ্ভিদ—তাদের কারোর পাতা সোজা উঁচু হয়ে থাকে (যেমন- কলমি), কারো বা পাতা শুয়ে থাকে (যেমন- পদ্ম), এ ছাড়া পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি।

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হলো নানা ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়। জীবের এই প্রাকৃতিক বাসভূমিকে ইংরেজিতে মেরিন হ্যাবিট্যাট বলা হয়। ওস্যানোগ্রাফি নামক বিজ্ঞানে সমুদ্রের প্রাকৃতিক ও জৈব পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। আয়তন অনুসারে পৃথিবীর প্রায় ৭১% সমুদ্র। সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় সবচেয়ে বেশি রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ।

সমুদ্র হলো পৃথিবীর বুকে একটানা বিশাল জলভাগ। কারণ প্রতিটি সমুদ্রই একে অপরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। তবে সমুদ্রের পানির উষ্ণতা, লবণাক্ততা, চাপ এবং গভীরতা অনুসারে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থানের এলাকা বদলে যায়।

সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত গড় লবণের পরিমাণ ৩.৫%। তবে মেরু অঞ্চলে বরফগলা পানি সমুদ্রে মেশে বলে এখানে লবণের পরিমাণ ৩.৪%। আবার ক্রান্তীয় এলাকায় বাষ্পীভবন বেশি হওয়ার জন্য দ্রবীভূত লবণের গড় পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৭%। ফলে সমুদ্রে সেই ধরনের উদ্ভিদই জন্মায় যারা অতিরিক্ত লবণ সহ্য করতে পারে। এই লবণপ্রিয় গাছপালাকে লোনা উদ্ভিদ (halophyte) বলে।

গভীরতা ও নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর-দক্ষিণে দূরত্ব অনুসারে সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বাড়ে কমে। যেমন— নিরক্ষীয় এলাকায় সমুদ্রের গড় উষ্ণতা ২৬.৬° সে.। কিন্তু মেরুর কাছাকাছি তা —৩.৬° সেলসিয়াসে নেমে যায়।

সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত পুষ্টিকর পদার্থ বা নিউট্রিয়েন্ট (nutrient) –এর পরিমাণ অল্প। সে কারণেও সমুদ্রের মধ্যে সব ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সব জায়গায় বসবাস করতে পারে না। তেমনি সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও প্রাণীর বসবাসের আলাদা আলাদা অঞ্চল আছে। নিচে সেরকম কয়েকটি অঞ্চল দেখানো হলো।

(ক) **তটীয় অঞ্চল** (neritic) : তটভূমির কাছে এবং উপকূল থেকে ধীরে ধীরে সমুদ্রের মধ্যে ঢালু হয়ে যাওয়া অগভীর মহীসোপানের উপর বিস্তৃত সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক বাসভূমিকে নেরিটিক অঞ্চল বলে। সমুদ্রের প্রায় ৩৬০ মি. গভীর পর্যন্ত নেরিটিক অঞ্চল বিস্তৃত। এখানে সামুদ্রিক শ্যাওলা, সার্ডিন প্রভৃতি মাছ ও অগভীর এলাকার অন্যান্য জলজ প্রাণী দেখা যায়।

(খ) **গভীর সমুদ্রের অঞ্চল** (bathyal) : উপকূল থেকে দূরে মোটামুটি মহীঢাল থেকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি পর্যন্ত এই অংশ বিস্তৃত। ৩৬০ মি. থেকে ৫০০০ মি. পর্যন্ত এই এলাকা গভীর হতে পারে। এখানের প্রায় সব অংশই ভীষণ অন্ধকার। এই অঞ্চলের বাসিন্দা হলো হেক, টুনা প্রভৃতি মাছ, প্রবাল কীট, সামুদ্রিক কাঁকড়া ইত্যাদি।

(গ) **আলোকিত অঞ্চল** (photic) : গ্রিক ফোস্ (phos) কথাটির অর্থ আলো। সুতরাং সমুদ্রের যে গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছায়, তাকে ফোটিক অঞ্চল বলে। একে ইংরেজিতে ইউফোটিক অঞ্চলও বলা হয়। এখানে জলজ উদ্ভিদ ও বসবাসকারী প্রাণীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সামুদ্রিক শ্যাওলা, হেরিং প্রভৃতি মাছ এখানে পাওয়া যায়।

৩.৩.১. প্রাকৃতিক আবাসভূমি হিসেবে মোহনা অঞ্চলের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য : মোহনা বলতে নদী ও সাগরের মিলন অঞ্চলকে বোঝায়। এখানে জোয়ার-ভাঁটার মাধ্যমে সাগরের লবণাক্ত ও নদীর মিষ্টি সুপেয় পানির মধ্যে মিশ্রণ ঘটে। এই প্রাকৃতিক বাসভূমি জীববৈচিত্র্য সমুদ্র ও নদীর তুলনায় অনেক বেশি। প্লাংক্টন, জলজ উদ্ভিদ, জলাভূমির লম্বা ঘাস, ইলিশ প্রভৃতি মাছ, কুমির, শুশুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণী এখানে বসবাস করে। এই বাসভূমিকে জলভাগের আবাসস্থল (estuarine habitat) বলা হয়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, মোহনা অঞ্চলে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে যে পরিমান শক্তি জলজ উদ্ভিদ যোগান দেয়, তার চেয়ে অনেক কম শক্তি এখানে খরচ হয়। তাছাড়া, এখানে জীবের বেঁচে থাকার জন্য দরকারি পুষ্টির যোগানও বেশি। ফলে মোহনা থেকে উদ্বৃত্ত শক্তি ও পুষ্টি সমুদ্রের অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলের দিকে স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়।

৩.৩.২. প্রাকৃতিক বাসভূমি হিসেবে স্থলভাগের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য : জীবের অন্যতম বাসভূমি হল স্থলভাগ। উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই প্রাকৃতিক বাসভূমিকে স্থলভাগের আবাসস্থল (terrestrial habitat) বলে। আয়তন অনুসারে পৃথিবীর প্রায় ২৯% স্থল ভাগ।

৩.৩.৩. আবাসভূমির বৈশিষ্ট্য : স্থলভাগে মাটির ভৌত এবং রায়াসনিক বৈশিষ্ট্য সমান নয় বলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন– পডজল মাটিতে সরলবর্গীয় বনভূমি, চারনোজেম মাটিতে তৃণভূমি ইত্যাদি দেখা যায়।

৩.৪. বায়োম (Biome)

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত মাটি ও জলবায়ুর সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে বস্তুতান্ত্রিক একক গড়ে তাকে বায়োম বলে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো—

(ক) বায়োমকে জলবায়ু এবং উদ্ভিদের ভিত্তিতে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

জলবায়ুর ভিত্তিতে বায়োমের শ্রেণিবিভাগ	উদ্ভিদের ভিত্তিতে বায়োমের শ্রেণিবিভাগ
১. তুন্দ্রা বায়োম	১. সুমেরু অঞ্চলের (arctic) তুন্দ্রা বায়োম ২. আল্পীয় (alpine) বা উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বায়োম ৩. তুন্দ্রা বায়োম
২. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বায়োম	১. তৈগা অরণ্য বায়োম ২. নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্যের বায়োম ৩. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম ৪. ভূমধ্যসাগরীয় বায়োম ৫. উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বায়োম
৩. ক্রান্তীয় বায়োম	১. ক্রান্তীয় অরণ্য বায়োম ২. সাভানা বায়োম বা ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম ৩. উষ্ণ মরুভূমি বায়োম

(খ) মাটি পানি এবং উষ্ণতার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে বায়োমকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

১) **ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম** (tropical rain forest)

নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম দেখা যায়। প্রজাতির সংখ্যা এবং তাদের বৃদ্ধিহার অনুসারে

ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যকে পৃথিবীর অন্যতম বৈচিত্র্যময় বায়োম বলা যায়। সারা বছর প্রায় ধারাবাহিকভাবে উষ্ণতার আধিক্য (৩৫° সে.), দিবারাত্রির সমান দৈর্ঘ্য, ৮০% এর বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত (২০০০–৪০০০ মি.মি./বছর) এই বায়োম অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ল্যাটেরাইট এই অঞ্চলের অন্যতম মাটি। এই মাটিতে লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ভাগ বেশি। উদ্ভিদ প্রজাতির বৈচিত্র্যে ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্যকে অনন্যসাধারণ বনভূমি বলে। এই গাছপালার মধ্যে যেমন সুবৃহৎ বৃক্ষ রয়েছে, তেমনি আছে সুদীর্ঘ দড়ির মতো কাষ্ঠলতা (liana), গুল্ম লতাপাতা, পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রভৃতি।

আফ্রিকা মহাদেশে কঙ্গো অববাহিকা, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়াতে জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপ এবং সংলগ্ন মায়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামের ভূ–খণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজান অববাহিকা অঞ্চল। ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য বায়োমের অন্তর্গত।

২) **টেম্পারেট পর্ণমোচী বনাঞ্চল বায়োম** (temperate deciduous forest biome) : সরলবর্গীয় অঞ্চলের ন্যায় এত শীতল না হলেও সমুদ্রের নিকটস্থ অঞ্চল ব্যতীত গড় উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকে। তবে সারা বছর বৃষ্টিপাত ভালই হয়। ওক, বীচ, মেপ্‌ল প্রভৃতি বৃক্ষের বনাঞ্চল। শীতকালে এই উদ্ভিদের পাতা ঝরে যায়। পূর্ব এশিয়া, উত্তর–পূর্ব আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে এ বনাঞ্চল দেখা যায়।

৩) **তৃণভূমি বায়োম** (grassland biome) : বিস্তীর্ণ এলাকা তৃণজাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছাদিত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫–৭৫ সে.মি.। উত্তর আমেরিকা, রাশিয়ার উত্তরভাগ, সাইবেরিয়া ও এশিয়ার কিছু অঞ্চলে এই প্রকার বায়োম অবস্থিত।

৪) **সাভানা বায়োম** (sabhana biome) : বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সাথে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত কিছু বৃক্ষ দেখা যায়। বৃক্ষগুলো খরা প্রতিরোধী এবং সর্বোচ্চ ১০ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট। আফ্রিকার উত্তরভাগ, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার কিছু অংশে এ বায়োম অবস্থিত।

৫) **উষ্ণ মরু বায়োম** (desert biome) : গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা ৩৫°–৪৫° সে.। শীতকালের গড় উষ্ণতা ১৬°–২৮° সে.। দিন ও রাতে উষ্ণতার পার্থক্য ২৫°–৪০° সেলসিয়াস। এখানে দিনে অত্যধিক গরম ও রাতে অত্যধিক ঠাণ্ডা। এখানে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫–২৫ সে.মি.। বৃষ্টিপাতের অভাবে মরু বায়োম কাঁটাযুক্ত গাছ জন্মায়। একে জেরোফাইট (xerophyte) গাছ বলে। যেমন— ক্যাকটাস, বাবলা, একাশিয়া প্রভৃতি। এছাড়া মরুদ্যান অঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ দেখা যায়। মাটি অনুর্বর ও মাটিতে ক্ষার ও বালির ভাগ বেশি। মরুদ্যান অঞ্চলে বেলে মাটি দেখা যায়। উষ্ণ মরু বায়োম উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ১০০ থেকে ৩০০ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত।

উষ্ণ মরু বায়োমের অন্তর্গত অঞ্চলসমূহ হলো—

(১) সাহারা মরুভূমি (লিবিয়া, মিশর, তিউনিশিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশ)।

(২) কালাহারি মরুভূমি (আফ্রিকার বৎসোয়ানা ও নামিবিয়া)।

(৩) দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমি বা আরবের মরুভূমি (এশিয়া মহাদেশের সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, ওমান ও ইয়েমেন)।

(৪) থর মরুভূমি (এশিয়া মহাদেশের ভারত ও পাকিস্তান)।

(৫) সোনোরান (উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো)।

(৬) আটাকামা (দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও পেরু)।

(৭) গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান মরুভূমি (অস্ট্রেলিয়ার মধ্য ও পশ্চিম ভাগ)।

৩.৪.১. তৈগা বায়োম বা টেম্পোরেট সরলবর্গীয় বনাঞ্চল (Taiga biome of temperate coniferono forest biome) : ইউরেশিয়ার সরলবর্গীয় বনভূমিকে তৈগা বলে। উত্তর গোলার্ধে ৫০°–৭০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে তৈগা বায়োম দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে নিউফাউন্ডল্যান্ড পর্যন্ত এলাকা তৈগা বায়োমের অন্তর্গত। শীত অতি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। বছরে অন্তত ছয় মাস তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে। গ্রীষ্ম ১০°–১৬° সেলসিয়াস। শীতকালে মাইনাস ৪০° থেকে মাইনাস ৬০° সে. অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মে উষ্ণতার পার্থক্য অত্যন্ত বেশি। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি (গড়ে ২৫–৫০ সে.মি.)। নরম কাঠের গাছের জন্য তৈগা বায়োম বিখ্যাত। পাইন, ফার, স্প্রুস, হেমকল, লার্চ, উইলো, অ্যাসপেন, অলডার, বার্চ, বিচ প্রভৃতি গাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই বায়োমের অতি শীতল অঞ্চলে লাইকেন ও মস জাতীয় শৈবাল জন্মায়।

৩.৪.২. তুন্দ্রা বায়োম (tundra biome) : তুন্দ্রা কথাটির অর্থ নগ্নভূমি (barren land)। তুন্দ্রা বায়োম হলো উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের জমাট বাঁধা তুষারাবৃত অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র আলাস্কার ব্যারো অঞ্চল পুরোটাই তুন্দ্রা অঞ্চল। এ অঞ্চলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মুজদ আছে। পৃথিবীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এখান থেকে প্রচুর কার্বন থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইডরূপে বাতাসে মুক্ত হচ্ছে। এর বিস্তার হলো ৬৬.৩০° থেকে ৭০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে।

১) অতি শীতল জলবায়ু এবং স্বল্প উষ্ণতা এই জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা গড়ে ১০০° সে.। শীতকালে এই উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে ৪০০° সে. পর্যন্ত নেমে যায়। বছরে নয় মাস উত্তাপ হিমাঙ্কের নিচে থাকে।

২) তুলনামূলকভাবে শীতল অঞ্চলে বা শীতকালে শৈবাল, মস ও ছোট ঘাস লাইকেন ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। ঘাস ও লতাগুল্ম সমৃদ্ধ এলাকাকে তৃণতুন্দ্রা বলে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাস্তুতন্ত্র

Ecosystem

৪.১. বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা হলো, যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জীবসম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে এবং সেই অঞ্চলের জড় বা অজৈব উপাদানের সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য উৎপন্ন উপাদানের বিনিময় ঘটায়, তাকে বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) বলে।

বাস্তুতন্ত্র হলো একটি ক্রিয়া পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ শুধু যে নিজেদের মধ্যেই সম্পর্ক তৈরি করে তাই নয়, সেই অঞ্চলের জড় উপাদান যেমন— মাটি, পানি, বায়ু এবং সূর্যালোকের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করতে সমথ হয়।

৪.২. বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

বাস্তুতন্ত্রের জীবজগতের বৃদ্ধি, গঠন প্রভৃতি নিম্নলিখিত পারিপার্শ্বিক কারণসমূহের উপর নির্ভর করে।

(ক) **জলবায়ুজনিত কারণ** (Climatic factor)

১) তাপ, ২) আলো, ৩) পানি, ৪) আর্দ্রতা, ৫) বায়ুপ্রবাহ, ৬) কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৭) অন্যান্য বায়বীয় গ্যাস।

(খ) **মৃত্তিকাজনিত কারণ** (Edaphic factor)

১) মৃত্তিকাস্থ পানির পরিমাণ, ২) মৃত্তিকাস্থ বায়ু, ৩) মৃত্তিকার উষ্ণতা, ৪) মৃত্তিকার রসের প্রকৃতি।

(গ) **জীবজনিত কারণ** (Biotic factor)

১) উদ্ভিদের প্রতিযোগিতা, ২) মৃত্তিকাস্থ জীবাণু, ৩) পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী ৪) মিথোজীবিতা, ৫) পশু-পাখি, ৬) মনুষ্য প্রভাব।

(ঘ) **ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কীয় করণ** (Topographic factor)

১) উচ্চতা, ২) ঢালু অবস্থা, ৩) সূর্যালোক ও বায়ু প্রবাহের প্রভাব।

বাস্তুতন্ত্র দুটি প্রধান উপাদানে তৈরি যথা— (ক) জড় বা অ্যাবায়োটিক (abiotic) উপাদান এবং (খ) জীব বা বায়োটিক (biotic) উপাদান।

(ক) **অ্যাবায়োটিক উপাদান :** বাস্তুতন্ত্রের রাসায়নিক এবং ভৌত উপাদানসমূহকে জড় অজীবজাত বা অ্যাবায়োটিক উপাদান বলে। এগুলো তিন ধরনের যেমন—

১) **অজৈব উপাদান :** যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, সালফার প্রভৃতি পদার্থ। এসব জীব ভূ–রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

২) **জৈব উপাদান :** যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, হিউমাস, ফ্যাট প্রভৃতি পদার্থ। এগুলো জীবজগতের জৈব রাসায়নিক গঠন তৈরি করতে সাহায্য করে।

৩) **ভৌত উপাদান বা জলবায়ু :** রাসায়নিক উপাদানগুলো ছাড়াও বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে কিছু ভৌত বা প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো— সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত, তাপ, বাতাস ইত্যাদি।

(খ) **বায়োটিক উপাদান :** বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১) **স্বভোজী জীব উপাদান** (autotrophic components) : স্বভোজী উপাদান বলতে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সেইসব জীবকে বোঝায় যেগুলো সৌরশক্তি শোষণ করে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি বিভিন্ন অজৈব উপাদানের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করতে পারে। শৈবাল, সবুজ উদ্ভিদ, সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি স্বভোজী উপাদানের উদাহারণ।

২) **পরভোজী উপাদান** (heterotrophic components) : বাস্তুরীতির মধ্যে যে সমস্ত জীব নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল, তাদের খাদক বা পরভোজী উপাদান বা কনজিউমার বলে।

৩) **তৃণভোজী** (herbivores) : খাদ্যের জন্য যেসব খাদক প্রাণ গাছপালা, লতা–পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের তৃণভোজী খাদক বা হার্বিভোর বলে। যেমন— গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি।

৪) **মাংসাশী-স্তন্যপায়ী** (carnivores) : খাদ্যের জন্য যে সমস্ত স্তন্যপায়ী ও মাংসাশী প্রাণী অন্যান্য প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে এদের মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। যেমন— বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। খাদকের খাদ্য গ্রহণের ধরন অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রাথমিক খাদক : যেসব খাদক খাদ্যের জন্য সরাসরি উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে তাদের প্রাথমিক খাদক বলে। এরা সবাই তৃণভোজী

প্রাণী। যেমন— গরু, ভেড়া, ছাগল, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষান্তরে প্রাথমিক খাদকদের প্রাইমারি কনজিউমার বলে।

গৌণ খাদক : যেসব খাদক প্রাণী খাদ্য হিসেবে তৃণভোজী প্রাণীদের বা প্রাথমিক খাদকদের খায়, তাদের দ্বিতীয় স্তরের খাদক বা গৌণ খাদক বলে। এরা মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। যেমন— কুকুর, বিড়াল, জলজ পতঙ্গ, ছোট মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষান্তরে এই স্তরের খাদকদের সেকেন্ডারি কনজিউমার বলে।

প্রগৌণ খাদক : যেসব খাদক প্রাণী খাদ্য হিসেবে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বা গৌণ খাদকদের উপর নির্ভর করে, তাদের প্রগৌণ খাদক বলে। ইংরেজি ভাষান্তরে এই স্তরের খাদকদের টার্সিয়ারি কনজিউমার বলে। যেমন— শোল, বোয়াল প্রভৃতি বড় মাছ, বক, পানকৌড়ি, উদবেড়াল, সাপ, মানুষ ইত্যাদি।

৪.২.১. **মাইক্রোকনজিউমার বা বিয়োজক :** বাস্তুতন্ত্রের যেসব উপাদান মৃতজীবী অর্থাৎ মৃত উদ্ভিদ ও খাদকদের মৃতদেহ বিয়োজিত করে আবার সরল রাসায়নিক যৌগে পরিণত করে তাদের বিয়োজক বলে। যেমন— ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। এগুলোকে ডিকম্পোজার বা মাইক্রোকনজিউমার (Decomposer or Micro-consumer) বলে। বিয়োজকরা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রোটোপ্লাজমের জটিল রাসায়নিক যৌগসমূহকে ভেঙে কিছুটা নিজেদের পুষ্টির জন্য ব্যবহার করে এবং বাকিটা অজৈব লবণ হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদেরা এই লবণগুলোকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে।

৪.৩. খাদ্যশৃঙ্খল

খাদ্য–খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদক স্তর থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য–শক্তির ধারাবাহিক প্রবাহকে খাদ্যশৃঙ্খল (food chain) বলে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খল দুই প্রকার। যেমন— (১) গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল (grassing food chain)। (২) ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল (detritus food chain)। গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল যে খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদক স্তর থেকে শক্তি ধাপে ধাপে তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়, তাকে গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল বলে। ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল হলো— যে খাদ্যশৃঙ্খলে বিয়োজক স্তর থেকে খাদক স্তরে শক্তি ধাপে ধাপে সঞ্চারিত হয়, তাকে ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

৪.৩.১. **খাদ্য-জালিকা বা ফুড ওয়েব** (food web) : বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য–খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা খাদ্য–শৃঙ্খলগুলো নানাভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত

হলে, পরিবেশে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে খাবারের আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে যে জাল গড়ে ওঠে তাকে খাদ্য-জাল বা খাদ্য-জালিকা বা ফুড ওয়েব বলে। যেমন—

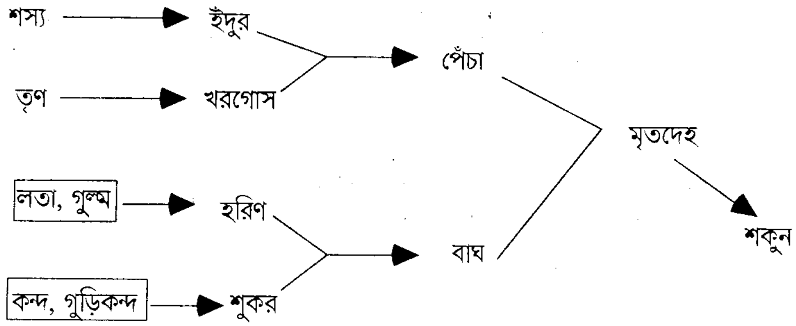

চিত্র ৪.১ : খাদ্য জালিকা

৪.৪. খাদ্য পিরামিড বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড

বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পুষ্টির গঠন বা খাদ্যের যোগান ব্যবস্থাকে পর পর ক্রম অনুসারে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর তৈরি হয়, তাকে খাদ্য পিরামিড বা ফুড পিরামিড (food pyramid) বলে। বাস্তুসংস্থানের পিরামিড বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড নামেও একে অভিহিত করা হয়।

খাদ্য পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরে রয়েছে উৎপাদক (যেমন– সবুজ উদ্ভিদ)। এরা সংখ্যায় ও পরিমাণে সবচেয়ে বেশি। খাদ্য পিরামিডের মধ্যে ক্রমশ উপরের স্তরে খাদ্যের যোগান যেমন কমতে থাকে, খাদকের সংখ্যাও হ্রাস পায়। এভাবে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। বাস্তুসংস্থানের পিরামিড তিন ধরনের যেমন—

(ক) **সংখ্যার পিরামিড :** কোনো বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের সংখ্যাকে ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয়, তাকে বাস্তুতন্ত্রের সংখ্যার পিরামিড বলে।

(খ) **শক্তির পিরামিড :** কোনো বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের মধ্যে অর্জিত শক্তির পরিমাণ ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয় তাকে বাস্তুতন্ত্রের শক্তির পিরামিড বলে। আলোচ্য পিরামিড অনুসারে সর্বনিম্ন খাদ্যস্তরে সৌরশক্তি থেকে অর্জিত শক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী উচ্চতর পুষ্টির স্তরগুলোতে নিম্নতর স্তর থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। বিজ্ঞানী লিন্ডেম্যান এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত দশ শতাংশ সূত্রতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন শক্তির পিরামিড অনুসারে সবুজ উদ্ভিদ স্তরে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত রয়েছে, তার সবটা প্রাথমিক খাদক স্তরে খাদ্যের মাধ্যমে পৌঁছাতে পারে না। তাই প্রাথমিক খাদক স্তর যেমন কীটপতঙ্গ স্তরে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ উদ্ভিদ স্তরের তুলনায় কম।

(গ) **বায়োমাস-এর পিরামিড :** কোনো বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের শুষ্ক ওজন বা জীবভরের পরিমাণ ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয়, তাকে বাস্তুতন্ত্রের জীবভরের (biomass) পিরামিড বলে।

৪.৫. বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন তন্ত্রের সাংগঠনিক পর্যায়

জীবতন্ত্র, পপুলেশনতন্ত্র ও কমিউনিটিতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) ইকোলজির অন্তর্ভুক্ত। এদের সাংগঠনিক পর্যায়গুলো নিম্নরূপ—

১) **একক জীব** (individual) : একটি একক জীব কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রজাতি হলো পপুলেশনের একক। বিজ্ঞানী আর্নস্ট হেয়ার–এর মতে প্রজাতি এমন এক প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী যারা অন্তঃজনন গুণসম্পন্ন এবং অন্য কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ গোষ্ঠীর সাথে যৌনমিলনে অক্ষম বা পৃথক।

২) **পপুলেশন** (population) : একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একই প্রজাতির আন্তর্ভুক্ত আন্তঃপ্রজননশীল জীবগোষ্ঠীকে এক কথায় পপুলেশন বলা হয়। যেমন— কোনো অঞ্চলের মানুষের পপুলেশন।

৩) **কমিউনিটি** (community) : একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই পরিবেশে বসবাসকারী একাধিক পপুলেশনের অন্তর্গত প্রাণী, উদ্ভিদ, আণুবীক্ষণিক জীবদের এক কথায় কমিউনিটি বলা হয়।

৪) **বায়োম** (biome) : বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত কোনো আঞ্চলিক পরিণত বা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত কমিউনিটিকে (climax community) বায়োম বলে।

৪.৫.১. পপুলেশনের বৃদ্ধি ও আন্তঃক্রিয়া : প্রতিটি পপুলেশনের বৃদ্ধি এবং বিকাশ দুটি শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো হলো (ক) প্রজনন ক্ষমতার হার এবং (খ) মৃত্যুর হার। প্রথম শর্তটি বায়োটিক পোটেনসিয়াল (biotic potential) এবং দ্বিতীয় শর্তটি পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধের (environmental resistance) উপর নির্ভর করে। পপুলেশনে কোনো প্রজাতির সংখ্যা কমে যাওয়ার অর্থাৎ মৃত্যুর অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধির একটিই উপায় তা হলো জনন। সিগময়েড গ্রোথ কার্ভ (S- আকৃতির গ্রাফ) কোনো একটি জীবহীন নগ্নভূমিতে প্রথমে নির্দিষ্ট প্রজাতির কতিপয় জীব বসতিস্থাপন করে, যাদের পায়োনিয়ার প্রজাতি (pioneer species) বলে। এদের বৃদ্ধি প্রথম অবস্থায় খুবই মন্থর হয়, কেননা পরিবেশে এদের খাপ খাওয়াতে সময় লাগে। পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর পর বৃদ্ধি দ্রুত হয় কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধের ফলে বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধের সাথে মানিয়ে নিয়ে পপুলেশন একটি সুস্থির বা ভারসাম্য অবস্থায় চলে আসে। বৃদ্ধির এইরূপ পরিবর্তন গ্রাফে অংকন করলে S–আকৃতির রূপ নেয়। একে সিগময়েড গ্রোথ কার্ভ (sigmoid growth curve) বলে। এটা নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১) **ল্যাগ ফেজ** (Lag phase) **বা পজিটিভ অ্যাস্‌সিলারেশন ফেজ** (positive accelaration phase) : প্রারম্ভিক অবস্থায় বৃদ্ধির হার কম থাকে কারণ এই পর্যায়ে জীব নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই পর্যায়কে ল্যাগ ফেজ বলে।

২) **লগারিদ্‌মিক ফেজ** (Logarithmic phase) : জীব যখন উক্ত পরিবেশে অভিযোজিত হয় এবং নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় তখন পপুলেশনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এই পর্যায়কে লগারিদ্‌মিক ফেজ বলে।

৩) **ভারসাম্য পর্যায়** (Equilibrium phase) **বা নেগেটিভ অ্যাক্‌সিলারেশন ফেজ** (negative accelaration phase) : একটি পপুলেশনে জীবের বৃদ্ধি তথা পপুলেশনের সামগ্রিক বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট সময় চলতে পারে না। কেননা প্রকৃতিতে খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদ সীমিত। তাছাড়া একটি ইকোসিস্টেমে কোনো পপুলেশন বিচ্ছিন্ন নয়। একটি পপুলেশন অন্য পপুলেশনের জীবের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেসব শর্ত পপুলেশনের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে তাদের এক কথায় পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধ বলে। পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় পপুলেশনের বৃদ্ধি হার কমে যায় এবং এক সময় শূন্য পর্যায়ে নেমে আসে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জন্ম ও মৃত্যুর হার সমান হয়। অন্য কথায় বলা যায়—পপুলেশন এই পর্যায়ে ভারসাম্য বা সুস্থির অবস্থায় অবস্থান করে। কাজেই S-কার্ভের শীর্ষ ভাগটি ভারসাম্যযুক্ত অবস্থানকে নির্দেশ করে। তাই উল্লেখ করা যায়, পরিবেশ এই নির্দিষ্ট মাত্রাকেই ধরে রাখতে সমর্থ। পরিবেশের এই সীমিত ক্ষমতাকে ধারণ ক্ষমতা (carrying capacity) বা সম্পৃক্ত অবস্থা (saturation level) বলে।

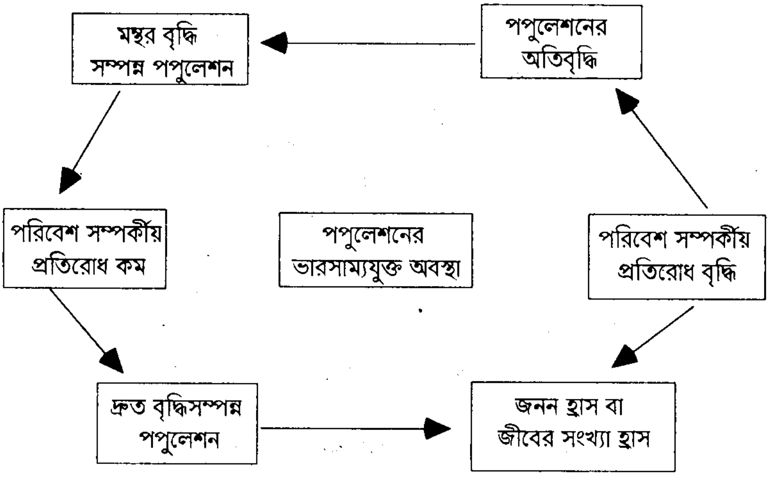

চিত্র ৪.১ : খাদ্য জালিকা

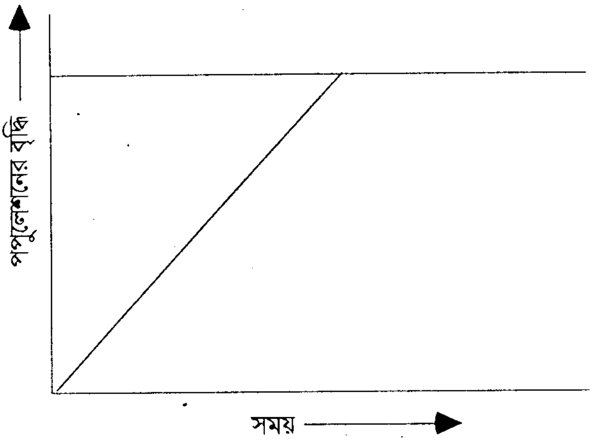

চিত্র ৪.২ : সিগময়েড গ্রোথ কার্ভ

J- আকৃতির বৃদ্ধির গ্রাফ : এক্ষেত্রে কোনো পপুলেশনে জীবের বৃদ্ধি প্রাথমিক অবস্থায় খুব ধীর গতিতে (leg phase) সম্পন্ন হলেও পরিবেশে অভিযোজনের পর অতিদ্রুত হারে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি হয়। কিন্তু হঠাৎ পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় পপুলেশনের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রকার বৃদ্ধির গ্রাফ 'J' আকৃতির রূপ নেয়। এই প্রকার বৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। হঠাৎ পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রতিরোধের ফলে পপুলেশনের বিনাশ ঘটতে পারে।

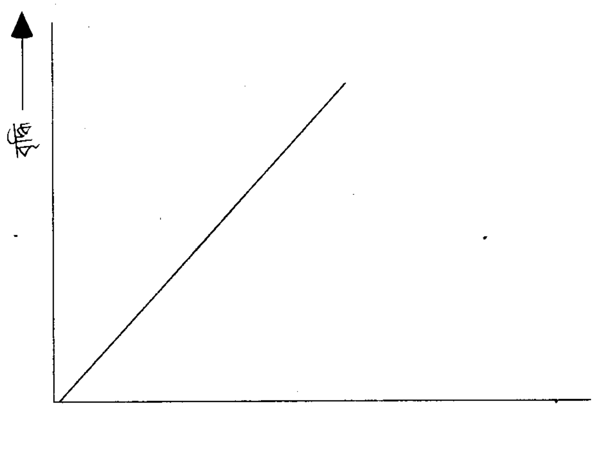

চিত্র ৪.৩ : J – আকৃতির কার্ভ

৪.৬. সালোকসংশ্লেষণ

আলোর উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের সম-অণু অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ বলে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, (photo) শব্দটির অর্থ আলো এবং (synthesis) শব্দটির অর্থ সংশ্লেষণ। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হলো —

সূর্যালোক

$$6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_2O_6 + 6H_2O \quad 6O_2$$

(কার্বন ডাই-অক্সাইড) পানি ক্লোরোফিল (গ্লুকোজ) (পানি) (অক্সিজেন)

৪.৬.১. সালোকসংশ্লেষণের পরিবেশগত গুরুত্ব

(১) সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে সম-অণু অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। ফলে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের নিয়মিত যোগান পাওয়া যায। সে কারণে সবুজ উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে গেলে প্রাণিজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(২) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং রাসায়নিক শক্তি খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। এর পরে খাদ্যের মাধ্যমে ঐ স্থৈতিক শক্তি প্রাণী ও মানুষের দেহে তাপশক্তি বা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ফলে সালোকসংশ্লেষণ শক্তিচক্র অক্ষুণ্ন রাখে।

৪.৬.২. জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বা পুষ্টিচক্র : জীবদেহের একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলসমূহ, যেমন— কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), সালফার (S), ক্যালসিয়াম (Ca) ইত্যাদি পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশের মধ্যে চক্রাকার পথে আবর্তিত হয়। একে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র বলা হয়। (biogeochemical cycle) আলোচ্য চক্র দুই ধরনের যথা (ক) গ্যাসীয় চক্র (gaseous cycle) , (খ) পলল চক্র (sedimentary cycle)।

৪.৬.৩ জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের পরিবেশগত গুরুত্ব : জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সাহায্যে পরিবেশের মধ্যে জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি উপাদানের যোগান

অক্ষুণ্ন থাকে। এই ছয়টি মৌল হলো — কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ ও জীবাণুর দেহ গঠনের জন্য এই মৌলগুলোর আমরন যোগান একান্ত প্রয়োজন।

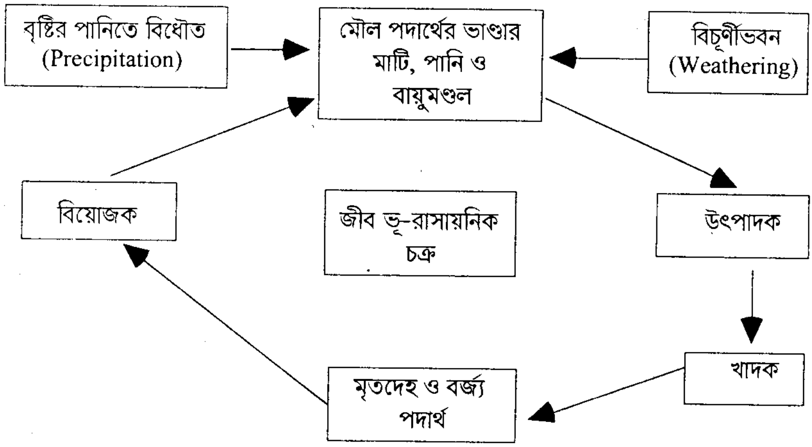

চিত্র ৪.৪ : জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র

জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র আছে বলেই সমগ্র জীবজগত এই অত্যাবশ্যক মৌলসমূহকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে শেষ করতে পারে না। জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের অস্তিত্ব না থাকলে পরিবেশে এই মৌলসমূহের অফুরন্ত যোগান সম্ভব হতো না। ফলে জীবজগত ধ্বংস হয়ে যেত। জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সাহায্যে পরিবেশে এবং জীবজগতের মধ্যে পরিপোষকের যোগান অক্ষুণ্ন থাকে জন্য একে পুষ্টি চক্র (nutrient cycle) বলে।

৪.৭. কার্বন চক্র

যে প্রক্রিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রূপে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে পরিবেশের মধ্যে কার্বনের সমতা রাখে তাকে কার্বন চক্র বলে।

পরিবেশের মধ্যে খাদ্যশৃঙ্খলের সাহায্যে যখন তৃণভোজী প্রাণি-উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বা মাংসাশী প্রাণী তৃণভোজীদের হয়, তখন প্রকৃতির কার্বন জীবদেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এর পরে শ্বাসকাজের মাধ্যমে বা শরীরের মধ্যে দহন ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পরে জীবাণুরা সেই মৃতদেহে পচন ধরায়। এর ফলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় এবং পরিবেশে আবার ফিয়ে যায়। এভাবে পরিবেশ থেকে

জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে কার্বন ডাই–অক্সাইডের আবর্তন ঘটে। ফলে পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই–অক্সাইডের যোগান অক্ষুণ্ণ থাকে ও সমতা বজায় থাকে।

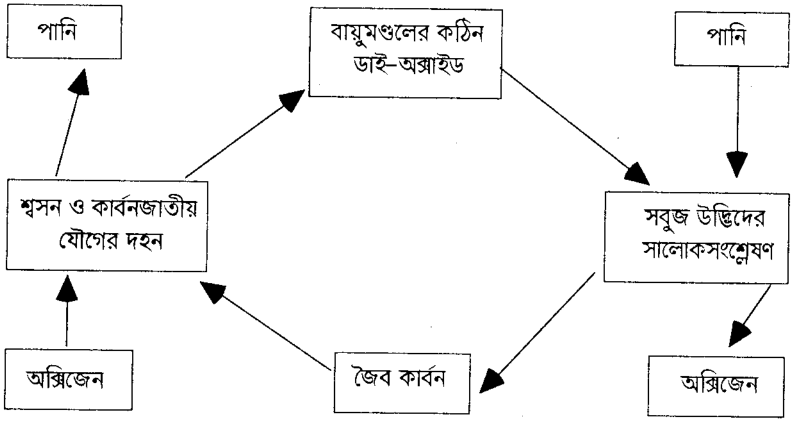

চিত্র ৪.৫ : কার্বন চক্র

৪.৮. নাইট্রোজেন চক্র

যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন জীবজগতে এবং জীবজগত থেকে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে আবর্তিত হয়ে পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখে তাকে নাইট্রোজেন বলে। নাইট্রোজেন চক্র জীব ভূ–রাসায়নিক চক্রের অন্যতম অঙ্গ। এই চক্রের দুটি পর্যায় রয়েছে। যেমন— নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বা স্থায়ীকরণ (nitrogen fixation) এবং নাইট্রোজেন মোচন (denitrification)।

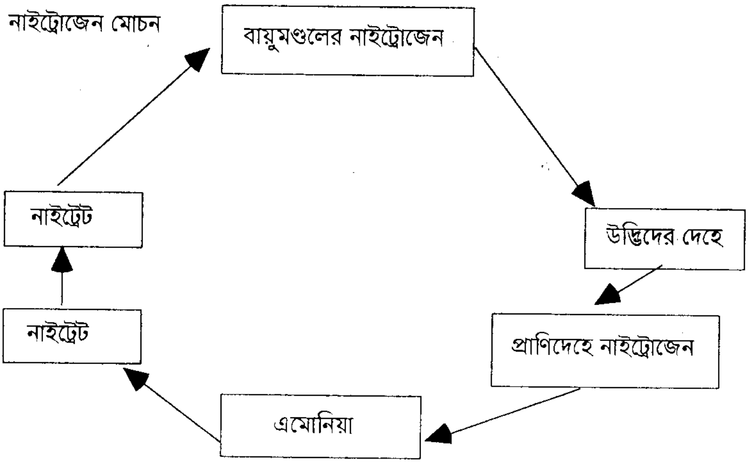

চিত্র ৪.৬ : নাইট্রোজেন চক্র

(ক) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ : যে পদ্ধতির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন জীবাণুদের দ্বারা মাটির মধ্যে আবদ্ধ হয় বা সঞ্চিত হয় তাকে নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ বলে। একে নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণও (nitrogen fixation) বলা যায়।

নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের পদ্ধতি

(১) বজ্রপাত হলে বা আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে বিদ্যুৎক্ষরণের জন্য বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট্রিক আক্সাইড তৈরি করে। নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে পরিণত হয়। বৃষ্টির পানির সাথে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড বিক্রিয়া করে নাইট্রাস ও নাইট্রিক এসিড তৈরি করে। বৃষ্টির পানি এ এসিডকে মাটিতে পৌঁছে দেয়। এ দুই ধরনের এসিড মাটির মধ্যে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি যৌগ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে মিশে যায়।

(২) মাটিতে নাইট্রোজনকে স্থায়ী করার জন্য কিছু ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবসমূহও কাজ করে। এরা বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করে সরাসরি মাটিতে নাইট্রেট রূপে আবদ্ধ করে। যেমন— *Rhizobium* নামক ব্যাকটেরিয়া। এছাড়া অ্যাজোটোব্যাক্টার *(Azotobacter)*, ক্লসট্রিডিয়াম *(Clostridium)*, সায়ানোব্যাকটেরিয়া *(Cyanobacteria)*, নীলাভ সবুজ শৈবাল *(Anabina)* ইত্যাদি জীবাণু ও শৈবাল মাটিতে নাইট্রোজেনকে এমোনিয়াম-এ ও পরে নাইট্রেট রূপে সরাসরি আবদ্ধ করে।

(৩) জীবজন্তুর মল-মূত্র এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচনের সময়ে এমোনিয়া তৈরি হয়। এই এমোনিয়া নাইট্রোসোমোনাস *Nitrosomonous* ব্যাকটিরিয়া দ্বারা নাইট্রেটে পরিণত হয়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

(খ) নাইট্রোজেন বিমুক্তকরণ : মাটিতে আবদ্ধ নাইট্রেট যৌগ সিউডোমোনাস *(Pseudomonus)* এবং প্যারাকক্কাস *(Paracoccus)* নামক ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর দ্বারা প্রথমে নাইট্রাস অক্সাইড ও পরে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। এই নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত করে তাদের ডিনাইট্রিফাইং (denitrifying) ব্যাকটেরিয়া বলে। এভাবে নাইট্রোজেন মৌল পরিবেশে আবর্তিত হয় এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের সমতা বজায় রাখে।

(গ) এমোনিফিকেশন : যে পদ্ধতির সাহায্যে মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন-- *Bacilius mycoides*, *Bacillus ramosus*), নাইট্রোজেন যৌগকে এমোনিয়ামে পরিণত করে তাকে এমোনিফিকেশন বলে। আসলে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে পচনের সময়ে এই ব্যাকটিরিয়াসমূহ অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত এমোনিয়াকে পরিবেশেমুক্ত করে দেয়।

(ঘ) **নাইট্রিফিকেশন :** নাইট্রিফিকেশন বলতে নাইট্রোজেনের সংযোজনকে বোঝায়। মৃত উদ্ভিদ, প্রাণিদেহ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেন যৌগসমূহ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বিয়োজিত হওয়ার ফলে প্রথমে এমোনিয়া, পরে নাইট্রাইট এবং সবশেষে নাইট্রেট যৌগে পরিণত হয়। জীবদেহ থেকে নাইট্রোজেনের এই মাটিতে ফিরে আসার বা পুনঃপ্রবেশ করার পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন বলা হয়। নাইট্রোজেন সংযোজনে যেসব ব্যাকটেরিয়া অংশগ্রহণ করে তাদের নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া বলে। যেমন— *Nitrosomonous, Nitrobacter* ইত্যাদি।

(ঙ) **নাইট্রোজেন মোচন বা ডি-নাইট্রিফিকেশন :** মাটির নাইয়েট্রিট যৌগ যে প্রক্রিয়া ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে আবার নাইট্রোজেন গ্যাস হিসেবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় তাকে নাইট্রোজেন মোচন বা ডি–নাইট্রিফিকেশন বলে। *Pseudomonus, Theobacillus* ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন মোচনে সাহায্য করে।

৪.৯. সামুদ্রিক অবক্ষেপ (Oceanic deposits)

ভূ-পৃষ্ঠের দেশসমূহ চতুর্দিক হতে সাগর, মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় প্রত্যেকটি মহাদেশকে এই একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। শুধু এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যবর্তী স্থান কোনো সাগর, মহাসাগর দ্বারা পৃথক হয় নাই। এশিয়ার পশ্চিম সীমা এবং ইউরোপের পূর্বসীমা স্থলভাগেই সম্মিলিত হওয়ার কারণে সমগ্র ইউরেশিয়া ভূখণ্ডকে মহাসাগর পরিবেষ্টিত একটি বৃহৎ দ্বীপ বলে মনে হয়। ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগ ও পানিরাশির এইরূপ অবস্থানের ফলে স্থলভাগের বিভিন্ন নদীনালা সাগর মহাসাগরে পতিত হয়েছে। ফলে স্থলভাগের এই সমস্ত দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের শিলাখণ্ড, কাঁকড়, বালুকণা, কর্দম, চুন প্রভৃতি পদার্থ নদী প্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বায়ু প্রবাহের দ্বারা ক্ষয় সাধিত হয় এবং এই ক্ষরিত পদার্থসমূহ বাহিত হয়ে সাগর–মহাসাগরের তলদেশে সঞ্চিত হয়। এটা ব্যতীত সমুদ্রে যেসব উদ্ভিদ জন্মে এবং জীবজন্তু বাস করে তাদের দেহাবশেষও সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। সমুদ্রের তলদেশে এরূপ সঞ্চিত পদার্থকে অবক্ষেপ (deposits) বলা হয়। এসব সঞ্চিত পদার্থ দীর্ঘকাল যাবৎ স্তরে স্তরে পুরু হতে থাকে এবং তাপ ও অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন পাললিক শিলায় পরিণত হয়। সামুদ্রিক অবক্ষেপ দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা— (১) অজৈব পদার্থের অবক্ষেপ (non-organic deposits) এবং (২) জৈব পদার্থের অবক্ষেপ (organic deposits)।

(ক) **অজৈব পদার্থের অবক্ষেপ :** নদীপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ প্রভৃতি শক্তি দ্বারা নিয়ত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন হচ্ছে। পানি স্রোত ও বায়ু প্রবাহ এসব ক্ষয়িত পদার্থ বহন করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী মহীসোপান ও মহীঢাল অঞ্চলে সঞ্চিত করে। ভূ-পৃষ্ঠের এসব ক্ষয়িত পদার্থই অজৈব পদার্থ। অগভীর সমুদ্রতলে সঞ্চিত এইরূপ অজৈব পদার্থকে নিকটতম সমুদ্র অবক্ষেপ (terrigenous deposit) বলা হয়। এরূপ পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নীলবর্ণের কর্দম (blue mud) পরিলক্ষিত হয়।

(খ) **জৈব পদার্থের অবক্ষেপ :** সাগর, মহাসাগরে মৎস্য, কীট, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি জীবজন্তু বাস করে ও বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে। এদের দেহাবশেষ সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। এসব সঞ্চিত পদার্থকে জৈব অবক্ষেপ বলা হয়। সাধারণত সমুদ্রের গভীরতম অংশেই জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এজন্যই এরূপ অবক্ষেপকে দূর সমুদ্র অবক্ষেপ (pelagic deposits) বলা হয়ে থাকে।

পানির গভীরতা অনুসারে মহাসাগরের তলদেশে সঞ্চিত পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা— অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ এবং গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ।

(ক) **অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ** (shallow water deposits) : স্থলভাগের ক্ষয়িত পদার্থসমূহ নদীর স্রোত ও বায়ু প্রবাহ দ্বারা বাহিত হয়ে অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হয়। যদিও এই অগভীর অংশে অজৈব পদার্থ সঞ্চিত হয়, কিন্তু কিছু জৈব পদার্থও সঞ্চিত হয়ে থাকে। অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড, বালু, কাঁকড়, কর্দম ইত্যাদি প্রধান। জৈব পদার্থের মধ্যে সেল ফিস (shell fish), সি-আরচিন (sea urchins), প্রবাল প্রভৃতি বেশি দেখা যায়। অগভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের দেহাবশেষ হতে উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদানও সেখানে সঞ্চিত হয়। এদের প্রাণিজ অবক্ষেপ বলে। এই জাতীয় অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপণকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

(অ) **তটদেশীয় অবক্ষেপ** (littoral deposits) : তীরভূমির যে স্থানের মধ্যে জোয়ার-ভাটার সময় পানি উঠানামা করে তাকে তটদেশীয় অঞ্চল বলে। এখানে পানির গভীরতা খুব কম। এই অঞ্চলে নানা জাতীয় বৃহদাকারের বালুকা, কর্দম এবং কাঁকর সঞ্চিত হয়।

(আ) **মহীসোপানে সঞ্চয়** (shelf deposits) : সমুদ্র উপকূলের পরবর্তী স্থান হতে মহীসোপানের সীমারেখা পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা ৬০০ ফুট বা তার চেয়েও কম। এই অঞ্চলে পলি, কর্দম, সূক্ষ্ম বালুকণা, প্রবাল প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত হয়। এগুলোকে মহীসোপানের সঞ্চয় বলা হয়। এসব সঞ্চিত পদার্থ ক্রমে ক্রমে পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষও এ সাথে সঞ্চিত হয়ে পাললিক শিলার অভ্যন্তরে জীবাশ্মে পরিণত হয়।

(ই) **মহীঢালের সঞ্চয়** (bathyal deposits) : মহীসোপানের পরবর্তী অংশই সমুদ্রের মহীঢাল। এই অঞ্চলের গভীরতা ৬০০ ফুট হতে ১২,০০০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। সমুদ্রের এই অংশে নীল কর্দম, লোহিত কর্দম এবং কোনো কোনো স্থানে প্রবাল সঞ্চিত হয়। এগুলোর মধ্যে নীল কর্দমের পরিমাণই বেশি। এগুলোর সাথে নানা প্রকার ধাতব পদার্থ বর্তমান থাকার দরুণ এরা বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে।

(ঈ) **আগ্নেয় পদার্থ সঞ্চয়** (volcanic deposits) : সমুদ্রের যেসব স্থানে আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান সেসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের দরুণ যে লাভা উৎক্ষিপ্ত হয় তা মহীসোপান, মহীঢাল বা সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় তীরে এই জাতীয় সঞ্চয় দেখা যায়।

(খ) **গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ** (deposits of the deep sea) : মহীঢাল যেখানে শেষ হয়েছে তার পর হতেই সমুদ্রের গভীর অংশ শুরু হয়েছে। সমুদ্রের এই গভীর তলদেশ ও খাতসমূহের সঞ্চয়কল্পে গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপ বলে। এই কারণে গভীর সমুদ্রের অবক্ষেপকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— গভীর সমুদ্রতলের সঞ্চয় ও সমুদ্রখাতে সঞ্চয়।

সমুদ্রের এই অঞ্চল দু'টিতে সঞ্চিত অজৈব পদার্থের মধ্যে আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণাই (volcanic dust) প্রধান। তবে জৈব পদার্থই এই অঞ্চলে অধিক সঞ্চিত হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও বিভিন্ন ভাসমান প্রাণীর দেহাবশেষ হতে এই জৈব পদার্থ গঠিত হয়। এসব জৈব পদার্থসমূহ ধীরে ধীরে সমুদ্রের গভীরতম অংশে সঞ্চিত হয়। এ জৈব পদার্থ তরল পিচ্ছিল কর্দমের ন্যায়। এগুলোকে সিন্ধুমল (ooze) বলে। গভীর সমুদ্রের এই জাতীয় জৈব অবক্ষেপকে দূর সমুদ্র সিন্ধুমল (pelagic ooze) বলা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই জাতীয় সিন্ধুমল এত ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় যে আটলান্টিক মহাসাগরে এক ইঞ্চি পরিমাণ সিন্ধুমল সঞ্চিত হতে প্রায় ২,০০০ বছর সময় লাগে। অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, কোনো কোনো স্থানে এই সিন্ধুমল ১০ হাজার হতে ১২ হাজার ফুট পর্যন্ত পুরু হয়ে সঞ্চিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনোটি কোটি বছর যাবৎ উপাদান সঞ্চিত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সঞ্চিত পদার্থ আটলান্টিক মহাসাগরের সঞ্চিত পদার্থ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের এগুলো জমা হতে অত্যধিক সময় লেগেছে। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অনুমান এই যে, প্রশান্ত মহাসাগরে এক ইঞ্চি পরিমাণ সিন্ধুমল সঞ্চিত হতে ২০ হাজার বছর সময় লাগে।

৪.১০. জীব বৈচিত্র্য

কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন পশু–পাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ এবং অণুজীবের বিভিন্নতা এবং এগুলোর সমন্বিত অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে। ভূ–প্রকৃতিক গঠন ও জলবায়ুর উপর জীববৈচিত্র্য নির্ভর করায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জীববৈচিত্র্য আলাদা। জলাভূমি, প্রাকৃতিক বনভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলই জীববৈচিত্র্যের বিশেষ আধার। জীববৈচিত্র্যের তিনটি স্তর হলো— ইকোসিস্টেম বৈচিত্র্য, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং জিনগত বৈচিত্র্য। বিজ্ঞানীদের কাছে প্রজাতিগত বৈচিত্র্যই গুরুত্বপূর্ণ আধার। বাংলাদেশে ১৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৮৮ প্রজাতির দেশী পাখি, ২৪০ প্রজাতির অতিথি পাখি, ১২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২২ প্রজাতির উভচর, ২৬৬ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ৪৪২ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ (IUCN, ২০০০) এবং প্রায় ৫০০০ প্রজাতির নগ্নবীজী উদ্ভিদ (সালার খান, ১৯৯৯) পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শক্তি ও পরিবেশ

Energy and Environment

পরিবেশ হলো সম্পদ ও শক্তির ধারক ও বাহক। পানি মাটি, লোহা, কয়লা প্রভৃতি সম্পদ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে জমা হয়ে রয়েছে। মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রম দিয়ে এই সম্পদগুলোকে আহরণ করে নিজের আর্থসামাজিক প্রয়োজন মেটায়।

৫.১. সম্পদ

সম্পদ কোনো বস্তু বা পদার্থ নয়। কোনো বস্তু বা পদার্থ যে কাজ করে বা কোনো পদার্থের মধ্যে যে কার্যকরী শক্তি লুকিয়ে রয়েছে সেই বস্তু বা পর্দার্থকে সম্পদ বলে।

৫.১.১. সম্পদের বৈশিষ্ট্য : কোনো বস্তু বা পদার্থকে তখনই সম্পদ বলা যায়, যখন সেগুলো নিম্নলিখিত গুণসম্পন্ন হয়। যেমন—

(১) উপযোগিতা বা অভাব মোচনের ক্ষমতা (utility)

(২) কার্যকারিতা (functionability)

(৩) প্রয়োগযোগ্যতা (serviceability)

(৪) গ্রহণযোগ্যতা (acceptibility)

(৫) সার্বজনীন চাহিদা (demand)

(৬) অপ্রচলিত হওয়া (obsolesecnce)

(৭) সীমাবদ্ধতা (limitation or inclasticity)

(৮) সুগম্যতা (accessibility)

(৯) পরিবেশমিত্রতা (eco-friendliness)।

৫.২. শক্তি

বস্তুর শক্তি এমন একটি ধর্ম যা কাজ থেকে পাওয়া যায় বা যাকে কাজে পরিবর্তিত করা যায়। পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির দেখা মেলে। যেমন উষ্ণতার জন্য তাপশক্তি, গতির জন্য গতিশক্তি, জড়বস্তুর স্থিতির জন্য স্থিতিশক্তি। এছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, চৌম্বক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

(ক) **চিরাচরিত শক্তি** (conventional energy) **:** চিরাচরিত শক্তি বলতে সেসব শক্তিকে বোঝায় যে উৎসসমূহ থেকে বহু যুগ ধরে মানুষ জ্বালানি শক্তি আহরণ করে চলেছে। যেমন— কয়লা, খনিজ তেল, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি।

(খ) **অচিরাচরিত শক্তি** (non-conventional energy) **:** অচিরাচরিত শক্তি বলতে সেসব শক্তিকে বোঝায় যে উৎসগুলো থেকে মানুষ ইদানীং জ্বালানি শক্তি আহরণ করার চেষ্টা করছে। যেমন, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি সৌরশক্তি ইত্যাদি। আসলে চিরাচরিত শক্তির যোগান ভবিষ্যতে অনিয়মিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে বলেই মানুষ অচিরাচরিত উৎসসমূহ থেকে শক্তি আহরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(গ) **ভূ-তাপীয় শক্তি :** ভূ-অভ্যন্তরের তাপকে কাজে লাগিয়ে যে শক্তি উৎপাদন করা যায় তাকে ভূ-তাপীয় শক্তি (geothermal energy) বলে। এই অচিরাচরিত শক্তি অফুরন্ত সম্পদ। কয়লা ও খনিজ তেলের মতো এই শক্তির নিঃশেষ হওয়ার আশংকা নেই। ভূ-তাপীয় শক্তি দূষণমুক্ত। ভূ-তাপীয় শক্তির প্রধান উৎসসমূহ হলো উষ্ণ প্রস্রবণ, ফুমারোল, আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন এলাকা প্রভৃতি।

(ঘ) **চিরাচরিত শক্তির বিকল্প হিসেবে বাতাসের শক্তি :** বহমান বাতাস থেকে যে শক্তি আহরণ করা যায়, তাকে বায়ু শক্তি বলে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র বায়ু বহমান অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং বাতাসের প্রবহমান শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষত সমুদ্রের ধারে উপকূলবর্তী অঞ্চলে সারা বছর এত জোরে বায়ু বয়, সেই শক্তিকে সহজেই মানুষ নানা কাজে লাগাতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাতাসের শক্তিকে ব্যবহার করে পানি তোলা, গম ভাঙা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ করা হয়।

৫.২.১. সৌরশক্তি : বাংলাদেশে বার্ষিক সৌর বিকিরণের হার ১৮০০-১৯০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা/বর্গমিটার। বাংলাদেশে সৌরশক্তি ধান, চাল, মাছ শুকনো ও লবণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। BCSIR -এর সৌরচুল্লি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌর হিটার এবং অন্যান্য NGO-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে সৌরশক্তির কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি সোলার ফটোভোল্টাইক সেল (SPV) এর ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে ইলেকট্রিক গ্রিড পৌঁছায়নি সেখানে মাইক্রোওয়েভ রিপিটার স্টেশন এবং আরও বিশেষ ক্ষেত্রে SPV ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.২.২. চিরাচরিত শক্তির বিকল্প হিসেবে জৈব গ্যাস : মানুষ ও প্রাণীর মলমূত্র, শাক-সবজির খোসা, কচুরিপানা, ফলের খোসা ও ছোবড়া প্রভৃতি জৈব আবর্জনা থেকে জৈব

রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে যে দাহ্য গ্যাস উৎপাদন করা যায়, এই দাহ্য গ্যাসকে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস (biogas) বলে।

বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি যে কাঁচামালটি ব্যবহার করা হয়, তা হলো গোবর। এই জন্য একে গোবরগ্যাসও বলে। বায়োগ্যাস বা গোবরগ্যাস উৎপাদনের জন্য তিন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া কাজ করে। বায়োগ্যাস উৎপাদনের তিনটি ধাপ আছে। এই গ্যাস থেকে ৬০% মিথেন পাওয়া যায় (বাকি ৪০% কার্বন ডাইঅক্সাইড)। জৈব গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ জৈব আবর্জনা কি ধরনের, তার উপর নির্ভর করে। যেমন—

(ক) ৪ থেকে ১০ কেজি সবজির খোসা থেকে ১ ঘনমিটার জৈব গ্যাস পাওয়া যায়।

(খ) ৭ থেকে ১৫ কেজি মুরগি ও শূকরের মলমূত্র থেকে ১ ঘনমিটার জৈব গ্যাস পাওয়া যায়।

(গ) ১০ থেকে ২০ কেজি গোবর বা ফেলে দেওয়া রান্না করা খাবার থেকে ১ ঘন মিটার জৈব গ্যাস পাওয়া যায়।

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশসমূহে বায়োগ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কারণ এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে। ফলে গবাদি পশুর মলমূত্র বা শাক-সবজির খোসাজাতীয় জৈব আবর্জনার যোগান প্রচুর। ভারতে অচিরাচরিত শক্তি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর প্রায় ১০০ বিলিয়ন টন গোবর উৎপন্ন হয়। এর থেকে বছরে অন্তত ৫ বিলিয়ন টন মিথেন পাওয়া সম্ভব।

সুবিধা : জৈব গ্যাস উৎপাদনের সুবিধা প্রচুর। যেমন— জৈব গ্যাস আবর্জনা থেকে উৎপন্ন সার কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায় এবং জৈব গ্যাস উৎপাদনের জন্য খুব জটিল ও দামি প্রযুক্তির দরকার নেই।

৫.২.২.১. জৈব গ্যাস উৎপাদন পদ্ধতি : নিম্নলিখিতভাবে জৈব গ্যাস উৎপাদন করা যায়।

(ক) প্রথমে মাটির উপরে জৈব পদার্থ জমানো বা সঞ্চয় করার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করতে হয়। একে মিশ্রণ আধার বলে। এই আধার থেকে একটা নল দিয়ে ডাইজেস্টারকে যুক্ত করা হয়।

(খ) ডাইজেস্টার হলো পচন কক্ষ। এটার অধিকাংশই মাটির মধ্যে গর্ত করে তৈরি করা হয়। মিশ্রণ আধারে পানি ও জৈব আবর্জনার যে মিশ্রণ বা মিকচার তৈরি হয়, তা নলের মাধ্যমে এনে এই ডাইজেস্টারে ১৫০ দিন রাখা হয়। ফলে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস তৈরি হতে হতে ডাইজেস্টারের গ্যাস কক্ষটি জৈব গ্যাসে ভরে ওঠে।

(গ) মিশ্রণ আধার ও ডাইজেস্টার ছাড়াও গ্যাস উৎপাদনের জন্য আর একটি চেম্বার বা আধার লাগে। এর মধ্যে নিষ্ক্রিয় জৈব আবর্জনা টেনে বের করে নেওয়া হয়। এই আধারকে বহির্গমন আধার বলে। বাংলাদেশে বিভিন্ন এনজিও শস্যের অবশিষ্টাংশ এবং পৌর এলাকার বর্জ্য থেকেও বায়োগ্যাস উৎপন্ন উন্নত চুলা করতে সক্ষম হয়েছে। LGED–এর ব্যাপারে হাঁস–মুরগি ও মানুষের মলমূত্র ব্যবহার করেছে।

উন্নত চুলা বা উনুন হলো সেই ধরনের উনুন যাতে কাঠ, পাটকাঠি প্রভৃতি জ্বালানি সাধারণ চুলার তুলনায় অনেক কম লাগে। সাধারণ চুলায় যতো জ্বালানি লাগে তার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ কম জ্বালানিতেই এই চুলায় রান্না করা যায়। এ ছাড়া, ধোঁয়া বা অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস বের করে দেওয়ার জন্য উন্নত চুলায় আলাদা করে নল লাগানো থাকে।

শুধু তাই নয়, এক সাথে দু–তিনটি পাত্রে যাতে রান্না করা যায়, তার বন্দোবস্ত এই চুলাতেই রয়েছে। ফলে একই পরিমাণ জ্বালানিতে কম সময়ে অনেক বেশি রান্না করা যায়। এতে জ্বালানির সাশ্রয় হয় ও খরচ কম পড়ে। BCSIR, LGED এবং বেশ কিছু NGO –এ বিষয়ে আগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব প্রতিবেশবিদ্যা

Human Ecology

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, বুদ্ধিবৃত্তি, চাহিদা এবং সুরক্ষা যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। কালক্রমে মানুষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

৬.১. পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক

প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্যপ্রাণীকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করার প্রচেষ্টা মানুষ শুরু করেছে মাত্র ১০ হাজার বছর আগে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে যেমন জাগ্রোস, এলব্রুস, টাউরুস ইত্যাদি পাহাড়ের ঢালে প্রথম বন্য ভেড়া, ছাগল, গবাদি পশু পালন করার কাজ শুরু হয়। এরপর ধীরে ধীরে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পশুপালনের কাজ ছড়িয়ে পড়ে।

৬.২. কৃষিকাজের বিকাশ

দক্ষিণ ইরানের আলি কোশ (Ali Kosh) অঞ্চল, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, ভারতের বিন্ধ্য পর্বতের বেলান নদী উপত্যকা ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে পাওয়া বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, পশুপালনের মতো কৃষিকাজের ইতিহাসও মাত্র ১০ হাজার বছরের পুরানো। এই সব অঞ্চলে যব, গম ও ধানের বীজ, রান্নার পাত্র, শিকারী মানুষের মাথা গোঁজার আস্তানা ইত্যাদি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে মধ্য এশিয়ার ইরান, ইরাক সংলগ্ন সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক, নীল নদ উপত্যকা, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং সুদূর চীনের হোয়াং-হো উপত্যকা ছিল কৃষিকাজের আদি অঞ্চল বা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার (Cultural heath)।

উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করে মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে। কারণ এখানকার জমি সমতল। মাটি পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। নদীর পানিকে সহজে পানিসেচের কাজে লাগানো যায়। বর্ষাকালে বন্যার পানি সরে গেলে যে পলি মাটি উপরে জমে থাকে, তা মাটির উর্বরতা রক্ষা করে—যার ফলে আলাদা করে সার দিয়ে জমিকে চাষের উপযুক্ত করতে হয় না।

৬.৩. পরিবেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক

পরিবেশ ও সংস্কৃতি এই দুটি বিষয়কে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আলাদা, এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। পরিবেশ যেন একটা প্রাকৃতিক বিষয়ে, আর সংস্কৃতি হলো মানবিক বিষয়। আসলে পরিবেশ ও সংস্কৃতি একে অন্যের সাথে নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে। পরিবেশ থেকে সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়া যায় না। তেমনি সংস্কৃতি থেকে পরিবেশকে বাদ দেওয়াও অসম্ভব। একটা উদাহরণের সাহায্যে এদের সম্পর্ককে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। যেমন— নারিকেল গাছ মাটি থেকে রস নিয়ে ডাবের মধ্যে পানি ভরে রাখে, তেমনি মানুষ পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সংস্কৃতিকে পোক্ত করে তোলে। এ সম্পর্কে একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক—সুন্দরবনে দিনে দু'বার জোয়ার আসে। জোয়ারের লোনা পানিতে বন ভেসে যায়। মাটি লোনা হয়ে ওঠে। তাই জোয়ারের লোনা পানি ঠেকাতে মানুষ নদীর দু'ধারে উঁচু বাঁধ দিল। ফলে চাষ-আবাদ করা সহজ হলো। সুন্দরবনের এই পরিবেশ থেকে মানুষ শিক্ষা না নিলে, তারা বাঁধ তৈরি করার কথা হয়তো ভাবতেন না। এই নির্মাণ বা প্রযুক্তির ব্যাপারটি হল সংস্কৃতি। এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ তার পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত শেখার মতো শত শত বিষয় রয়েছে। এই শিক্ষা নিতে পারলে মানুষের উন্নতি হবে, সংস্কৃতিবান হবে।

পরিবেশ ও সংস্কৃতি মেলবন্ধনে মানুষ যা পারে, তা হলো—

(১) প্রকৃতির বাধা, যেমন— বন্যা, ধস, ভূমিক্ষয় প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(২) প্রকৃতি, পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, ভূ-তাপীয়শক্তি (geothermal energy) উৎপাদন করতে পারে।

(৩) প্রকৃতি বন্ধুভাবাপন্ন হলে পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে পারে। যেমন— কক্সবাজার।

(৪) পরিবেশের সঙ্গে মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ তৈরি করতে পারে। যেমন— আরব দেশের লোকজনের সাদা আলখাল্লা, এস্কিমোদের বরফের তৈরি ঘর বা ইগলু।

৬.৪. পরিবেশকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা

জড়জগতকে মানুষ জীবিকা অর্জনের কারণে বা বেঁচে থাকার তাগিদে ক্রমাগত পরিবের্তন করে। এই পরিবর্তন কৃষিকাজ, শিল্পস্থাপন, শিল্পায়ন, নগরায়ন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে চলতেই থাকে। মানুষ প্রকৃতিকে দু'ভাবে প্রভাবিত করে। যথা— (ক) ধীরগতির পরিবর্তন এবং (খ) দ্রুত বা আকস্মিক পরিবর্তন।

(ক) **ধীরগতির পরিবর্তন :** জড়জগতের ধীর পরিবর্তন মানুষের যেসব কাজের জন্য সম্ভব হয়, তা হলো —

(১) **চাষাবাদ :** মানুষের সাংস্কৃতিক জগতে শস্য-উৎপাদন বা চাষ-আবাদের কাজ এক ধরনের বিপ্লবের সূচনা করেছে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী মানুষ ঋতু

পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যে দিন স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করল এবং জমিকে নিজের প্রয়োজনে খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হলো জড়জগৎ সেই মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। যে কারণে এই পরিবর্তন তা হলো— চাষবাসের জন্য বন হনন বা বৃক্ষছেদন, লাঙল দেওয়ার ফলে মাটির গঠনগত রূপান্তর, সার দেওয়ার ফলে মাটির A এবং B স্তরের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন, চাষ–আবাদের কারণে আপাত অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের ধ্বংস, আধুনিক কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মাটি, পানি এবং জীবজগতের ধীর পরিবর্তন।

(২) **শিল্পোন্নয়ন :** আগুনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ফলে মানুষ যেমন যাযাবর অবস্থা থেকে স্থায়ী আস্তানা বা স্থায়ী নিবাস তৈরি করতে পেরেছে, তেমনি চাকা এবং রূপশক্তির আবিষ্কার মানুষকে শিল্পনির্ভর আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছে। ফলে শুধু কৃষির মাধ্যমেই জড়জগৎ আর পরিবর্তিত হয় না। আধুনিক শিল্পের প্রভাবে মাটি, পানি, বাতাস, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ এবং মানুষ–এর পরিবেশের মধ্যেও আসে ধীরগতির পরিবর্তন।

(ক.১) পরিবেশের ধীর গতির পরিবর্তনের প্রমাণ

(১) খনি থেকে সম্পদ আহরণের চেষ্টা এবং ভূ প্রকৃতির পরিবর্তন।

(২) শিল্পের জন্য বন সম্পদ সংগ্রহ এবং গাছ কাটার ফলে বনভূমি এলাকার ধীর পরিবর্তন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিগত কয়েক দশকে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও অন্য কোনো বনভূমি এলাকা সেইভাবে পরিবর্তিত হয়নি। U.S.A.–এর স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট এর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের এলাকা প্রতিবছর গড়ে এক কোটি হেক্টর হ্রাস পায়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ কাটার জন্য, পশুজাত খাদ্য উৎপাদনের তাগিদে, পশুচারণের উপযুক্ত তৃণভূমি তৈরি করার জন্য এবং জনবসতির মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে ক্রান্তীয় বনভূমি এলাকা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে।

(৩) পরিবেশের মধ্যে ধীর পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হলো পরিবেশ দূষণ। গ্রিন হাউস প্রভাব, এসিড বৃষ্টি, শিল্পজাত আবর্জনার সঞ্চয়, ডিটারজেন্টের ব্যবহার, সমুদ্রজলে ভাসমান তেল প্রভৃতি ঘটনার প্রভাবে পরিবেশের মধ্যে ধীর গতির পরিবর্তন হয়।

গ্রিন হাউস প্রভাব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ধীরে ধীরে উষ্ণ করে তুলেছে। কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং এ গ্যাসগুলোর পরিমাণ শিল্পোন্নয়নের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস ও

ধোঁয়ার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপ প্রায় ২০° কেলভিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে এখন আশংকা করা হচ্ছে।

এসিড বৃষ্টির প্রভাবেও জড়জগতের পরিবর্তন হয়। আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ছাড়া পৃথিবীতে এসিড বৃষ্টির জন্য ভারি শিল্পগুলো দায়ী। যানবাহন, কলকারখানা, ধাতু নিষ্কাশন চুল্লি প্রভৃতি থেকে নিঃসৃত গ্যাস এবং দহনের ফলে নির্গত ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলে পানিচক্রের মাধ্যমে এই পদার্থগুলো পৃথিবীতে নেমে আসে। এ ধরনের জলের গড় PH ৫.৬৫।

শিল্পজাত আবর্জনা যেমন তামা, সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু এবং অজৈব সালফার যৌগ, ফসফরাস, ক্লোরিনজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠের উপর ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে জড়জগতকে ধীর গতিতে প্রভাবিত করে।

সারণি ৬.১ : বিভিন্ন শিল্প এবং তাদের বর্জ্য পদার্থের নাম

শিল্প	বর্জ্য পদার্থ
১. পরমাণু শক্তিকেন্দ্র	ক্লোরাইড
২. ব্যাটারি উৎপাদন	সীসা ও এসিড
৩. কাগজ	ক্লোরিন
৪. রবার	দস্তা
৫. সার	ফসফেট ও ক্লোরাইড
৬. রঙ উৎপাদন	ফেনল যৌগ ও সীসা
৭. তৈল শোধনাগার	হাইড্রোকার্বন, ফেনল, চর্বি, তেল
৮. রাসায়নিক	জৈব এসিড, ফেনল ইত্যাদি

(৪) শিল্পজাত আবর্জনা এবং বর্জ্য পদার্থ জড়জগতকে যেভাবে প্রভাবিত করে তার কিছু উদাহরণ হলো—

- ❑ পারদ, সীসা, দস্তা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতব দূষিত পদার্থ মাটির মধ্যে দরকারি জীবাণু ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।
- ❑ কলকারখানা থেকে নির্গত লবণ মাটিকে দূষিত করে। ফলে খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়।
- ❑ এমাইনো এসিড, এলবুমিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে বিভিন্ন সালফার ও ফসফরাস যৌগ উৎপাদন করে। এই যৌগসমূহ থেকে মাটির পক্ষে ক্ষতিকর ফসফরাস অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

- কার্বন ১৪, ম্যাঙ্গানিজ ৫৪, কোবাল্ট ৫৭, জিঙ্ক ৬৫ প্রভৃতি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ মানুষ ও জীবজন্তুকে পঙ্গু করে। বিভিন্ন স্নায়ুরোগ এই আবর্জনার প্রভাবে সৃষ্টি হয়।

(ক) **পরিবহণ ও নগরায়ন :** পরিবহণ ও নগরায়ন ব্যবস্থা আধুনিক মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক হলেও এদের যৌথ প্রভাবে জড়জগতের মধ্যে পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে। পরিবহণ ও নগরায়নের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের যেসব পরিবর্তন ঘটে তা নিম্নরূপ —

১) সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের জন্য ভূমি ঢালের পরিবর্তন হয়।

২) নদীখাতের মধ্যে সেতু নির্মাণের জন্য কংক্রিট ও ইস্পাতের কাঠামো তৈরি করলে সংশ্লিষ্ট নদীখাদের পরিবর্তন হয়।

৩) যানবাহনের পরিত্যক্ত গ্যাস যথা— কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

৪) জনবসতি স্থাপনের জন্য জলাশয় ভরাট করা, বন ধ্বংস করা প্রভৃতি পরিবেশের মধ্যে ভৌত পরিবর্তন ঘটায়।

৬.৫. সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যার প্রভাব

জনসংখ্যার পরিমাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং বয়স অনুসারে জনসংখ্যার পরিমাপ সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। আসলে, জমির বহন ক্ষমতা ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব থেকে এ কথা বলা যায় যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশের উন্নতির জন্য কতটা লোকজন দরকার বা কি পরিমান জনসংখ্যা উন্নতির পথে সমস্যা তৈরি করতে পারে সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারনা নেই। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট জনসংখ্যা কোনো বিশেষ দেশের পক্ষে উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে আবার ঐ একই জনসংখ্যা অন্য দেশের পক্ষে উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিতে পারে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাবসমূহ নিচের তালিকায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

৬.৫.১. অনুকূল প্রভাব

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক ও শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। ফলে সম্পদের আহরণ এবং উৎপাদন বাড়ে।

২) উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক ও শ্রমের চাহিদা বাড়ে। তবে বিভিন্ন পেশায় কত লোক নিযুক্ত হবে, তা নির্ধারিত হয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তির উপর অর্থাৎ শ্রমনিবিড় বা যন্ত্রনির্ভর কি ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা দেশে রয়েছে তার উপর, মজুরির হার শ্রমিকের খাতে মোট খরচের উপর, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার উপর, শ্রম ও অন্যান্য উপাদানের ব্যবহার ও পরিবর্তনের উপর।

৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাজারের আয়তন বাড়ে অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৬.৫.২. প্রতিকূল প্রভাব

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের যোগান দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কারণ খাদ্যের উৎপাদন বর্ধিত হয় গাণিতিক হারে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় গুণোত্তর হারে। সেক্ষেত্রে অপুষ্টি, অনাহার প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়।

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি হ্রাস পায়। কারণ মোট উৎপাদনের হার যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম, সেখানে মাথাপিছু উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে।

৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা মোট উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করলে মাথা পিছু আয় কমে যায়। ফলে গণ–দারিদ্রের সৃষ্টি হয়।

৪) দারিদ্র্য এবং অপুষ্টির জন্য শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

৫) জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়লে এবং উৎপাদন কমলে বেকারত্ব বাড়ে। কৃষি ক্ষেত্রে বেকারত্ব দেখা যায়।

৬) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে। জমির অবক্ষয় বাড়ে, অরণ্যের বিনাশ হয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যা বাড়ে। যেমন— বাসস্থানের সমস্যা, বন্যার সমস্যা, পুনর্বাসনের সমস্যা, আইন–শৃঙ্খলার সমস্যা ইত্যাদি।

৭) বিদেশী সাহায্য, অনুদান ঋণ প্রভৃতির মাত্রা বাড়ে, ফলে জনগণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে।

৬.৫.৩. মানুষের মাধ্যমে পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব

মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক পরিবেশের মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন এনে ফেলেছে যার প্রভাবে প্রকৃতি ও মানুষ ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের যেমন শেষ নেই, তেমনি এই ক্ষতিরও শেষ কোথায় তার উত্তর খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

মানুষের কাজের ফলে পরিবেশের এই পরিবর্তনের চাপ প্রথমে স্বাস্থ্যের উপর তারপরে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ–সুবিধা ও সৌন্দর্য চেতনার উপর এবং তারপরে বাস্তুতন্ত্র ও প্রকৃতির ভারসাম্যের উপরে পড়ে। তাই পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য—

১) প্রথম স্তরে প্রভাবিত হয় বাসস্থান

২) দ্বিতীয় স্তরে প্রভাবিত হয় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ–সুবিধা ও সৌদর্য চেতনা

৩) তৃতীয় স্তরে প্রভাবিত হয় বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য

সপ্তম অধ্যায়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবেশ

Natural Disaster and Environment

যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঘটনা মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি করে, সেগুলোই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যেমন– ধস, ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, বন্যা, খরা ইত্যাদি।

৭.১. ধস

পাহাড়ের ঢাল বরাবর মাধ্যাকর্ষণের টানে পাথরের চাঁই, শিলাচূর্ণ, মাটি এবং অন্যান্য আলগা পদার্থের হঠাৎ নেমে আসা বা খসে পড়ার ঘটনাকে ধস (Landslide) বলে। সাধারণত বর্ষাকালে পাহাড়ে ধস নামে। তবে ভূমিকম্প হলে বা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময়েও ধস নামতে পারে। ধস নামলে মানুষ ও পরিবেশের প্রচুর ক্ষতি হয়। তাই এটি মানুষের কাছে একটা বিশেষ সমস্যা। ধস নামার অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু প্রকৃতির নিজস্ব আর কিছু মানুষের তৈরি। নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে পাহাড়ে ধস নামতে পারে।

ক. প্রাকৃতিক কারণ

১) **প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য :** পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে মাটি, পাথর জলে ভিজে আলগা ও ভারী হয়ে যায়। তখন মাধ্যকর্ষণের টানে নিচে খসে পড়ে।

২) **পাথর আলগা হওয়ার জন্য :** পাহাড়ি অঞ্চলে বহুদিন ধরে পানি, বাতাস, সূর্যতাপ, গাছের শিকড়ের চাপ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রভৃতির কারণে পাথর ফেটে যায়। দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই দুর্বল পাথরের স্তূপ ধসে নিচের দিকে নামতে থাকে।

৩) **মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকার জন্য :** যে মাটিতে বালির ভাগ বেশি সে মাটির মধ্যে সহজেই পানি ঢুকে যেতে পারে। ফলে মাটি ভারী হয়ে ধস তৈরি করে।

৪) **ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের জন্য :** ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে আসায় মাটি কাঁপতে থাকে। ফলে ধস নামে।

খ. মানুষের তৈরি কারণ

১) **মাটির উপরে গাছপালার আবরণ না থাকার জন্য :** বন কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হলে মাটির উপরে তখন গাছপালার আবরণ থাকে না। এই অবস্থায় বৃষ্টির পানি দিনের পর দিন মাটিকে সরাসরি আঘাত করে ক্ষয় করে। আর প্রচুর পানি মাটির মধ্যে অনবরত ঢুকে যায়। মাটি দুর্বল হয়ে খসে পড়ে এবং ধস নামে।

৭.১.১. ধসের জন্য পরিবেশের ক্ষতি

১) ধস নামলে গাছপালা ভেঙে পড়ে। ফলে বনভূমি নষ্ট হয়।

২) ধসে যাওয়া মাটি সাধারণত বালি, কাঁকর, পাথরে ভর্তি থাকে। ফলে মাটির গুণ নষ্ট হয়। আর যেখান থেকে ধস নামলো, সেখানে পাহাড়ের ঢালে কঠিন পাথর বা শিলাস্তর বেরিয়ে পড়ে। তাই ধসের ফলে যেখানে থেকে মাটি নামলো আর ধসের আলগা পাথুরে মাটি যেখানে নেমে জমা হল, সেই দু' জায়গারই মাটির ক্ষতি হয়।

৩) ধস নামার জন্য পাহাড়ের ঢাল নষ্ট হয়। অর্থাৎ পাহাড়ি ঢাল আরও খাড়া ও দুর্বল হয়। সেই নষ্ট হওয়া ঢালের উপর ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরি করা যায় না।

৪) পাহাড়ি ধস অনেক সময় নামতে নামতে নদীর বুকে এসে জমা হয় এবং নাব্যতা কমে যায়। তখন অস্বাভাবিকভাবে পানি জমতে থাকে। বর্ষায় পানির চাপে বাঁধ ভেঙে গেলে, প্রবল পানির স্রোতে নদীর দু'পাশে বন্যা হয়।

৫) ধস নামার জন্য ভূমি ক্ষয় হয়।

৭.১.২. ধস নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

১) বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সেতু, প্রভৃতি নির্মাণ করার আগে সেই এলাকার মাটি, পাথর ইত্যাদি কতটা চাপ সহ্য করতে পারে, তার ভূ-তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা উচিত।

২) জমির সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। একে জমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা বলে। যেখানে যেমন মাটির চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, সে অনুযায়ী কোথাও জনবসতি, কোথাও রাস্তাঘাট, কোথাও চা-বাগান বা অন্যান্য বাগিচা পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলা দরকার।

৩) ধসপ্রবণ এলাকায় মাটির মধ্যে যাতে পানি বসতে না পারে এবং উদ্বৃত্ত জমা পানি যাতে সহজে বেরিয়ে আসে তার জন্য বিভিন্ন কারিগরি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার।

৪) পাহাড়ের দুর্বল ঢাল যাতে ধসে না যায়, সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঁচিল গেঁথে দেওয়া দরকার। এই পাঁচিলগুলো কংক্রিটের হতে পারে বা পাথরের চাঁই পর পর সাজিয়ে জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি।

৫) পাহাড়ি ঢালে নতুন করে গাছ লাগানো দরকার এবং বেআইনি গাছ কাটা বন্ধ করা প্রয়োজন।

৬) লোকজনকে ধসের বিপদ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করা জরুরি।

৭.২. ভূমিকম্প

প্রাকৃতিক কারণেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে হঠাৎ যে কম্পন হয় তাকে ভূমিকম্প (Earthquake) বা ভূ-কম্প বলে। ভূমিকম্পের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। ভূমিকম্পের কাঁপুনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এই কম্পন যত দূর ছড়ায়, তার জোর বা ধ্বংস করার ক্ষমতা তত কমে। ভূমিম্প অনেক কারণে হতে পারে—এর মধ্যে কিছু প্রকৃতির নিজস্ব আর অল্প কিছু মানুষের তৈরি।

ক. প্রাকৃতিক কারণ

১) **চলমান পাতের জন্য :** আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, ভূ-ত্বক অনেক ছোট-বড় শক্ত পাথরের চাদরে মোড়া রয়েছে। শিলায় তৈরি এই চাদরসমূহকে পাত বা প্লেট বলে। এই পাতসমূহ সচল। ভূ-ত্বকের পাতসমূহ চলতে চলতে যখন একটা পাত অন্য পাতের সঙ্গে ধাক্কা খায় বা হালকা পাতের নিচে ভারী পাত ঢুকে পড়ে তখন ভূমিকম্প হয়। যেমন ১৯২৩-এ জাপানের হনসু দ্বীপের ভূমিকম্প, ১৯৬৬ ও ১৯৭০-এ তুরস্কের ভূমিকম্প এই পাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য ঘটেছে।

২) **অগ্ন্যুৎপাতের জন্য :** আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভা সজোরে বেরিয়ে আসার সময়ে ভূমিকম্প হয়। যেমন ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত ও ভমিকম্পের উৎপত্তি হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, সব অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে ভূমিকম্প হয় না।

৩) **ধস নামার জন্য :** পাহাড়ি অঞ্চলে বিরাট ধস নামলে ভূমিকম্প হয়। এ সময় হাজার হাজার টন ওজনের মাটি পাথর খসে খসে নেমে আসে ও সজোরে নিচে ধাক্কা দেয়। ভূ-ত্বক কেঁপে ওঠে।

৪) **ভূ-অভ্যন্তরের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জন্য :** পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলায় ভাঁজ পড়লে বা ফাটল দেখা দিলে অথবা চাপের তারতম্য হলে ভূমিকম্প হয়।

খ. মানুষের তৈরি কারণ

১) ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশে বড় জলাধার তৈরি করলে।

২) মাটির নিচে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করলে ভূমিকম্প হয়।

৭.২.১. ভূমিকম্প পরিমাপ : ভূমিকম্প পরিমাপের যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ (Scismograph) গ্রিক শব্দ *Seismos* শব্দের অর্থ ভূ-কম্পন। আধুনিক সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ফটোগ্রাফিক কাগজের উপর আলোকরশ্মির সাহায্যে ভূ-কম্পন সরাসরি আঁকা হয়ে যায়। তবে পুরোনো ধরনের সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ঘুরন্ত চোঙের গায়ে আটকানো কাগজের উপর ভূকম্পন সরাসরি আঁকা হয়ে যেত। ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের জন্য দুটি স্কেল আছে। যথা— রেকটার স্কেল, ও মার্কালি স্কেল।

১) **রেকটার স্কেল :** ১৯৩৫ সালে মার্কিন ভূ–তত্ত্ববিদ চার্লস্ রেকটার এই স্কেল আবিষ্কার করেন। এই স্কেলে ০ থেকে ১০ পর্যন্ত ভাগ আছে। রেকটার স্কেলে ৪.৫ বা এর বেশি ভূমিকম্প অর্থই বেশ জোর ভূ–কম্পন হয়েছে বলে ধরতে হবে। আর ৭ বা ৭–এর বেশি মান হলে তা হবে তীব্র বা সাংঘাতিক ভূমিকম্প।

২) **মার্কালি স্কেল :** এই স্কেলে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত ভাগ আছে। ১–৩ অর্থ মৃদু ভূমিকম্প। ৪–৭ মানে বেশ জোর ভূমিকম্প। আর ৮–১২ মানে তীব্র বা সাংঘাতিক ভূমিকম্প।

৭.২.২. ভূমিকম্পের পরিবেশগত গুরুত্ব : ভূমিকম্প পরিবেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা। ভূমিকম্প বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। তবে ভূমিকম্পের ফলে বাড়ি–ঘর, সেতু, বাঁধ, রাস্তা, রেললাইন, কলকারখানার যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পেলে লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়।

ভূমিকম্পের প্রভাবে মানুষ ও পরিবেশের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেমন—

১) নদীর গতিপথের পরিবর্তন হতে পারে। ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের কিছু অংশ পুরানো প্রবাহ ছেড়ে নতুন জায়গা দিয়ে বইতে শুরু করেছে।

২) মাটির উপর বিরাট ফাটল দেখা দিতে পারে ও সেই ফাটল দিয়ে গ্যাস, গরম বাষ্প, কাদা বেরিয়ে আসতে পারে।

৩) জমি উঁচু–নিচু হয়ে যেতে পারে।

৪) আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে।

৫) পাহাড়ে ধস নামতে পারে।

৬) বনভূমি ধ্বংস হতে পারে।

৭) চাষের জমি নষ্ট হতে পারে।

৮) বাঁধ, জলাধার, সেতু, পথঘাট, রেললাইন, বড় বড় বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সামাজিক পরিকাঠামো ধ্বংস হতে পারে।

৯) বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে আগুন লাগতে পারে।

১০) মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

৭.৩. ভূমি ক্ষয়

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জমির উপরিভাগের এক ইঞ্চি স্তর তৈরি হতে লাগে কয়েকশত বছর কিন্তু তা ধ্বংস হতে সময় লাগে খুবই সামান্য সময়। নদী, বৃষ্টির পানি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে এবং চাষবাস, বন হনন, অতিরিক্ত পশুপালন ইত্যাদি মানুষের তৈরি কারণে দুর্বল মাটির অস্বাভাবিক অপসারণকে ভূমিক্ষয় বলে। মাটির স্তর ক্রমাগত

অস্বাভাবিক হারে ক্ষয়ে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। এর কিছুটা প্রাকৃতিক কারণ আর কিছুটা মানুষের কর্মফল।

ক. **ভূমিক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণ :** ভূমিক্ষয়ের প্রকৃতি কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১) **খাড়া ঢাল :** খাড়াই পাহাড়ি ঢালের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে সেই বৃষ্টির পানি মাটি ধুয়ে যায়।

২) **স্বল্প বনভূমি :** মাটির উপর গাছপালার ঘন আবরণ না থাকলে বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে ভূমিক্ষয় হয়।

৩) **আলগা মাটি :** মাটিতে চটচটে আঠালো ভাব না থাকলে, ভূমিক্ষয় সহজ হয়। সে কারণে সমুদ্রের ধারে, মরুভূমির কাছে, মালভূমির ঢালে মাটি তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। কেননা, এ সব এলাকার মাটিতে বালির ভাগ বেশি। তাই মাটির বাঁধন আলগা।

খ. **মানুষের তৈরি কারণে ভূমিক্ষয় :** মানুষের সৃষ্ট যেসব কারণে ভূমিক্ষয় হয় তা নিম্নরূপ—

১) **বনভূমির বিলোপ :** অতিরিক্ত গাছ কেটে ফেলার জন্য মাটির কণাসমূহ আলগা হয়ে যায়। ফলে গাছের শিকড় আর তখন মাটিকে আঁকড়ে রাখতে পারে না।

২) **ধাপ চাষ :** পাহাড়ি ঢালের উপর চাষ-আবাদ করার জন্য ধাপ কাটা হয়। এই ধাপ জমির সমোন্নতি রেখা (contour) বরাবর তৈরি করা না হলে বৃষ্টির পানির আঘাতে বা জলপ্রবাহের মাধ্যমে মাটি ক্ষয়ে যায়।

৩) **অনিয়ন্ত্রিত পশুপালন :** পাহাড়ি অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণ করা হলেও ভূমিক্ষয় হয়। কারণ গবাদি পশু মাটির উপরের ঘাসের আবরণকে খেয়ে প্রায় নির্মূল করে ফেলে।

৪) **ত্রুটিপূর্ণ সেচ :** সেচ ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক হলে মাটির গুণমান নষ্ট হয়। ফলে ভূমিক্ষয়ের হার বৃদ্ধি পায়।

ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউট-এর সমীক্ষায় পর্যবেশিত হয়েছে যে, প্রতি বছর পৃথিবীর প্রধান কৃষি অঞ্চলসমূহ থেকে বছরে প্রায় ২,৫০০ কোটি টন উর্বর মাটি ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আর সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে ভূমিক্ষয়ের মোট পরিমাণ হলো প্রতি বছর প্রায় ৭,৭০০ কোটি টন।

৭.৩.১. **ভূমিক্ষয়ের পরিবেশগত গুরুত্ব :** পরিবেশ হলো উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ মধ্যে মাটিরও প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। যেমন—

৭.৩.১.১. **প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব :** ভূমিক্ষয় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে, যেমন—

১) মাটি ছাড়া গাছপালা জন্মায় না। কারণ মাটি উদ্ভিদকে পুষ্টি যোগান দেয়। ফলে ভূমিক্ষয় হলে মাটির উর্বরতা কমে ও গাছপালার পরিমাণ কমে যায়।

২) বালি, পলি ও কাদাকণা দিয়ে মাটি তৈরি হয়। ফলে মাটির মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে পানি চুঁয়ে মাটির নিচে পানিস্তর তৈরি করে। এজন্য ভূমিক্ষয় হলে মাটির মধ্যে পানির যোগান কমে যায়। ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নেমে যায়।

৩) মাটি বৃষ্টির পানি ধারণ করে এবং সূর্যের তাপে কিছুটা পানি মাটি থেকে বাষ্পীভূত হয়। সেই বাষ্প পরে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে। ফলে ভূমিক্ষয় হলে পানিচক্র ব্যাহত হয়।

৪) মাটির মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারের বিয়োজক প্রকৃতির জীবাণু বসবাস করে। যেমন— ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। এদের কাজ হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ ও জৈব আবর্জনাকে দ্রুত পচিয়ে নষ্ট করে ফেলা এবং সেই পদার্থগুলো থেকে পুষ্টিকর রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন করে মাটিতে জমিয়ে রাখা। সুতরাং ভূমিক্ষয় হলে বিয়োজকগুলোর বাসভূমি নষ্ট হয় এবং খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হয়।

৫) ভূমিক্ষয় হলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়। নদীতে বন্যা দেখা দেয়।

৬) ভূমিক্ষয়ের জন্য বিভিন্ন জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৭.৩.১.২. মানবিক পরিবেশের উপর প্রভাব : ভূমি ক্ষয়ের জন্য মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মে সমস্যা দেখা দেয়, যেমন—

১) উর্বর মাটি ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে ফলন কমে যায়। ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়।

২) ভূমিক্ষয় বেশি হলে মাটি ধুয়ে শেষ পর্যন্ত নদীর মধ্যে এসে জমা হয়। ফলে নদীর গভীরতা কমে যায়। নদী নৌ-পরিবহনের অযোগ্য হয়ে ওঠে।

৩) ভূমিক্ষয়ের ফলে পানিসেচ ব্যবস্থার ক্ষতি হয়।

৪) ভূমিক্ষয়ের ফলে নদী মজে গেলে নদীর মোহনায় গড়ে তোলা বন্দরের ক্ষতি হয়। কলকাতা বন্দরের ক্ষেত্রে এই সমস্যা সাম্প্রতিককালে বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে।

৫) ভূমিক্ষয়ের জন্য জলাজমির মধ্যে মাটি জমতে জমতে ভরাট হয়ে ওঠে। ফলে সেই জলাজমির বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়। শহরের পানি সেই জলাজমিতে তখন জমা হওয়ার সুযোগ পায় না। ফলে অল্প বৃষ্টিতে শহরে পানি জমে, রোগ ছড়ায়।

৭.৩.২. ভূমিক্ষয়ের প্রকারভেদ : ভূমিক্ষয় তিন ধরনের যেমন—

ক. **শিট ভূমিক্ষয় :** বৃষ্টির পানিতে ভূমির ঢাল বরাবর জমির উপরের পাতলা মাটির আস্তরণ চাদরের মতো সরে গেলে শিট ভূমিক্ষয় হয়।

খ. **রিল ভূমিক্ষয় :** মাটির উপর বর্ষার পানিতে সরু লম্বা অগভীর গর্ত তৈরি হয়। এই খাত বরাবর মাটি ধুয়ে যায়। একে রিল ভূমিক্ষয় বলে। ইংরেজি Rill শব্দের অর্থ বৃষ্টির পানিতে তৈরি অগভীর খাত।

গ. **নালী ভূমিক্ষয় :** রিলগুলি গভীর ও আরও লম্ব হয়ে নালী তৈরি করে এবং সেই নালী বরাবর বৃষ্টির পানি মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। একে নালী ভূমিক্ষয় বলে।

৭.৩.৩. ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করার উপায় : ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করার অনেক উপায় আছে। এক্ষেত্রে জমি অনুসারে, জমির ব্যবহার অনুসারে এবং ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিতে হয়। ভূমিক্ষয় নিবারণ করা ও মাটি সংরক্ষণ করার মূল কয়েকটি পদ্ধতি হলো—

১) পাহাড়ি এলাকায় ধাপ চাষ, বলয় কৃষি এবং জমির উচ্চতা অনুসারে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা চালু করা ;

২) স্থানান্তর কৃষি, যেমন— জুম চাষ বন্ধ করা ;

৩) বনসৃজন করা ;

৪) পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা ;

৫) বিভিন্ন ধরনের পাঁচালি নির্মাণ করা ; যেমন— কংক্রিটের পাঁচালি, জাল দিয়ে মোড়া পাথরের পাঁচালি, গাছের গুঁড়ি বা বালির বস্তা দিয়ে তৈরি করা পাঁচালি ইত্যাদি।

৭.৪. খরা

খরা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হলে বা বহুদিন ধরে বৃষ্টি না হলে যে অস্বাভাবিক শুষ্ক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে খরা বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া দপ্তর (U.S. National Weather Service) আবহাওয়ার শুষ্ক অবস্থা বা খরাকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। যেমন—

১) **শুষ্ক পর্ব** (dry spell) : হাল্‌কা বা ভারী বর্ষার সময় একনাগাড়ে পনের দিন ধরে মোট বৃষ্টির পরিমাণ যদি মাত্র ০.৮ মিলিমিটারের কম হয়, তা হলে সেই অবস্থাকে শুষ্ক পর্ব খরা বলে।

২) **আংশিক খরা** (partial drought) : বছরের যে সময়ে বৃষ্টি হওয়ার কথা, সেই সময়ে একটানা ২৯ দিন ধরে যদি গড়ে দৈনিক ০.২ মিলিলিটারের কম বৃদ্ধি হয়, তবে এই অবস্থাকে আংশিক খরা বলে।

৩) **প্রকৃত খরা** (absolute drought) : বর্ষাকালে একনাগাড়ে কম করে ১৫ দিন যদি কোনো বৃষ্টি না হয়, তবে তাকে প্রকৃত খরা পরিস্থিতি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

তবে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খরার অবস্থা সমান নয়। বৃষ্টিবহুল দেশে যে পরিস্থিতিকে খরা বলে স্বাভাবিকভাবেই যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ কম অর্থাৎ শুষ্ক জায়গা সেখানে খরা পরিস্থিতি আলাদা।

৭.৪.১. খরার কারণ : খরা যেমন প্রাকৃতিক কারণে হতে পারে তেমনি খরা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য মানুষেরও হাত আছে। যেমন—

ক. প্রাকৃতিক কারণ

১) কোনো প্রাকৃতিক কারণে আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ এবং শুষ্ক হয়ে ওঠার ফলে খরা দেখা দেয়।

২) গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য পৃথিবীর গড় তাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। ফলে খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

৩) বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেশি হলে খরা হয়।

খ. মানুষের তৈরি কারণ

১) অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ কেটে ফেলার জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্পের যোগান কমে যায়। ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং খরার আশংকা দেখা দেয়।

২) ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি শহর, বাড়ি, অট্টালিকা ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে, যেখানে এইসব বাড়িঘর কলকারখানার ঘন সমাবেশ তৈরি হয়, সেখানে স্থানীয়ভাবে উষ্ণতা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তপ্ত আবহাওয়াকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে এবং খরা দেখা দেয়।

৭.৪.২. **পরিবেশের উপর খরার প্রভাব :** উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে। খরার প্রভাবে জীবজগতের এই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত হয়।

ক. গাছপালার উপর প্রভাব : জলের অভাবে গাছপালা শুকিয়ে যায় এবং পাতা ঝরে যায়। ফলে সালোকসংশ্লেষণ বিঘ্নিত হয়। অঙ্কুরোদ্গমের হার কমে যায়।

খ. জীবজন্তুর উপর প্রভাব : খরার প্রকোপে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দেয় এবং পানির অভাবে অসংখ্য জীবজন্তু মারা যায়। খরার কবলে বিস্তীর্ণ এলাকার গাছপালা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় বলে তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই কারণেও প্রচুর জীবজন্তু মারা যায়।

গ. মানুষের উপর খরার প্রভাব

১) খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে যায়। ফলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়।

২) ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায়। জলসেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

৩) দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

৪) পুষ্টিহীনতার কারণে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা প্রাণ হারায়।

৫) পানির অভাবে চাষবাস বন্ধ হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবে রোগের আক্রমণ ত্বরান্বিত হয়।

৬) তাপ প্রবাহেই প্রচুর লোক মারা যায়।

৭) খরাপীড়িত অঞ্চলের জনসংখ্যা স্থানান্তরে অন্য এলাকার উপর সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

ঘ. পরিবেশের উপর খরার প্রভাব

১) খাদ্যশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হয়।

২) পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৩) মরুভূমি আয়তন বড় হতে থাকে। অর্থাৎ মরুভূমি সম্প্রসারিত হয়।

৪) অগভীর নলকূপগুলো অকেজো হওয়ায় অধিক মূল্যবান ও পরিবেশের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ নয় এমন জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

৭.৫. বন্যা

নদী তার দু'কূল ছাপিয়ে যখন চারপাশকে জলমগ্ন করে তখন বন্যা হয়। বন্যা মানুষের ক্ষতি করে। পরিবেশকে দূষিত করে। বন্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশের মূলপথ তিনটি কিন্তু নির্গমনের পথ একটি। যখনই পানির প্রবাহ নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে তখনই বন্যা হয়। নিম্নলিখিত কারণে বন্যা হয়ে থাকে—

ক. প্রাকৃতিক কারণ : বন্যা সৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১) অতিরিক্ত এবং একটানা প্রবল বর্ষণের কারণে বন্যা হয়।

২) নদীর পানিবহন ক্ষমতা কমে গেলে বন্যা হয়।

৩) ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীতে ক্রমাগত পলি জমা হওয়ার জন্য নদীর গভীরতা কমে গেলে বন্যা হয়।

৪) পাহাড় থেকে সমতলে নামার সময়ে নদী খাতের ঢাল থেকে হঠাৎ মৃদু ঢালে পৌঁছে যায় ফলে পাহাড়ের পাদদেশে বন্যা হয়।

খ. মানুষের তৈরি কারণ : মানুষের যেসব কর্মকাণ্ড বন্যা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে তা নিম্নরূপ—

১) পাহাড়ি এলাকায় অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদ, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অতিরিক্ত বনহনন বা গাছ কেটে ফেলার জন্য ভূমিক্ষয় বাড়ে। ফলে নদী গভীরতা হারায় ও অল্প বৃষ্টিতেই নদীতে বন্যা হয়।

২) বাঁধের পিছনে কৃত্রিম জলাধারে ক্রমাগত পলি জমা হওয়ার ফলে বাঁধের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। সেই অতিরিক্ত পলি নিয়মিত কেটে পরিষ্কার করা না হলে ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন বর্ষায় পানি ধরে রাখার পরিবর্তে বাঁধ কর্তৃপক্ষ পানি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে বন্যা হয়।

৩) নদীর দু'পাশে অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি, শিল্প, চাষের জমি গড়ে তোলার ফলে নদী স্বাভাবিকভাবেই বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে বিনা বাধায় যতদূর প্রসারিত হতে পারতো, এখন আর তা পারে না। ফলে বন্যা হয়।

৪) গ্রাম ও শহরের আশেপাশে জলাশয় ও জলাভূমিকে ঢেকে ফেলার জন্য বর্ষার পানি সেই নিচু জমিতে আর জমা হওয়ার সুযোগ পায় না। এজন্য বন্যা হয়। যেমন— জলাভূমি ক্রমশ ভরাট করা হয়েছে, কিন্তু খালগুলোর সংস্কার করা হয়নি।

৭.৫.১. পরিবেশের উপর বন্যার প্রভাব : পরিবেশ হলো উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার মতো পারিপার্শ্বিক অবস্থা। বন্যা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগের প্রভাবে গাছপালার ক্ষতি হয়। জীবজন্তু প্রাণ হারায়। মানুষের জীবন ও সম্পত্তির

BANBDOC Library
Accession No. 20721

ক্ষতি হয়। এজন্য পরিবেশের উপর বন্যার নেতিবাচক প্রভাব আছে। এটা ঠিকই যে বন্যার ফলে যে নতুন পলি জমে তা মাটিকে উর্বর করে। উদ্ভিদের পুষ্টি যোগায়। কিন্তু তার পরিবর্তে পরিবেশকে ও বিশেষত মানুষকে যে মূল্য দিতে হয়, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

ক. গাছপালার উপর বন্যার প্রভাব

১) বন্যার জলে ছোট ছোট গাছপালা ও শস্য বিশেষভাবে ধান, গম, শাক–সবজির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্যার প্রকোপে এইসব নরম গাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়।

২) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ব্যাহত হয়। পাতা ঝরে যায়, শিকড় পচে যায় ফলে উৎপাদক স্তরে সবুজ গাছপালার যোগান ব্যাহত হয়।

খ. জীবজন্তুর উপর বন্যার প্রভাব

১) বন্যার প্রবল স্রোতের মুখে কত জীবজন্ত যে প্রতি বছর ভেসে যায় এদের অধিকাংশই মারা যায়।

২) বন্যার প্রকোপে তৃণভোজী জীবজন্তুর খাবারে টান পড়ে। ফলে অনাহারেও বহু প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

গ. মানুষের উপর বন্যার প্রভাব

১) চাষাবাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বহু পরিশ্রমে চাষ করা শস্য ও শাক–সবজির মাঠেই নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার শস্য বন্যার কারণে নষ্ট হয়।

২) বন্যার প্রকোপে বহু মানুষ যে শুধু প্রাণ হারায় তাই নয় ঘর–বাড়ি, ধনসম্পদ, বন্যার জলে ভেসে যায়। দরিদ্র চাষী নিঃস্ব হয়। শ্রমিকের উপার্জন স্তব্ধ হয়। মানুষের সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

৩) বন্যা জনসাধারনের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলিকেও বিপর্যস্ত করে। যেমন— রাস্তা ভেঙে যায়। রেললাইন ভেসে যায়। নদীর ধারে ছোট ছোট বাঁধ ভেঙে যায়। পানীয় জলের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগানে টান পড়ে। আন্ত্রিক, কলেরা প্রভৃতি রোগ ছড়ায়। ফলে বন্যা মানুষের কাছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে।

ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বন্যার প্রভাব

১) খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্য জালিকা বিঘ্নিত হয়।

২) পানি দূষিত হয়।

৩) মাটি দূষিত হয় এবং মাটি এসিডিক হয়ে ওঠে।

৪) পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৭.৫.২. বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

১) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু উদ্দেশ্যসাধক নদী পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

২) ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট বা জলবিভাজিকা সংরক্ষণের জন্য বনসৃজন, ভূমিক্ষয় নিবারণ প্রভৃতি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩) নদীর দুর্বল পাড় বরাবর বাঁধ নির্মাণ করা, পাঁচিল গেঁথে দেওয়া ইত্যাদি কারিগরি পদ্ধতিগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪) নদীর গভীরতা রক্ষার জন্য নদীর তলদেশ থেকে নিয়মিত মাটি কাটার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একে ড্রেজিং বলে। অনেক স্থানেই ড্রেজিং করা হয়েছে।

৫) পাহাড়ী অঞ্চলে ধস ও বন্যা একে অপরের সাথে জড়িত বলে এগুলো নিবারণের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬) বন্যাপীড়িত মানুষের আশ্রয়ের জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী শিবির গড়ে তোলা হয়েছে।

৭) বন্যার প্রকোপে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য বন্যাপ্রবণ এলাকায় জমির সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের চেষ্টা চলছে।

৮) দৈনন্দিন আবহাওয়ার উপর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে নিয়মিত নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্যোগের আগে জনগণকে আগাম সতর্ক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭.৬. সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অল্প পরিসর স্থানে বায়ুর চাপ আকস্মিকভাবে এরূপ হয় যে মধ্যস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে চাপ ক্রমশ বেশি। পরে চাপের ক্ষমতা রক্ষার্থে চারিদিকের শীতল উচ্চচাপবিশিষ্ট অঞ্চল হতে শীতল ও ভারী বায়ু প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে। উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করে এই বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সেখানে শীতল হয়ে জলীয় বাষ্প মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি করে। এভাবে ঘূর্ণবতা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ক কিছু তথ্য উপস্থাপিত হলো।

(ক) ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এই ঘূর্ণিঝড়ের হার হচ্ছে ১.৩ বছর, গড় গতিবেগ ১৫০ কিমি. এবং জলোচ্ছ্বাসের গড় উচ্চতা ৯ মিটার।

(খ) ঘূর্ণবাত বা সাইক্লোন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— ওয়েস্ট ইন্ডিজে হারিকেন, চীন ও জাপানে টাইফুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডো, উত্তর ভারতে আঁধি ইত্যাদি।

(গ) সাইক্লোন পরিবেশের সমস্যা বলে মনে করার কারণ হলো, সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় মানুষের ধন-সম্পদের ক্ষতি করে। বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়।

মানুষের বসতবাড়ি ভেঙে মানুষকে গৃহহারা করে। সামগ্রিকভাবে মানবিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

(ঘ) লিন এবং হাইনরিখসেন, ১৯৯২ সালে তাঁদের অ্যাটলাস অফ্ দ্য এনভায়রনমেন্ট গ্রন্থে শুধু ১৯৮০–১৯৯১ সালের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণহানির যে তালিকা দিয়েছেন, তা এক কথায় ভয়ঙ্কর। নিচে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কিছু সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.১ : ১৯৮০–১৯৯১ সালের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণহানির তালিকা (লেন এবং হাইনরিখসেন, ১৯৯২)

দেশ	ঝড়ের তাণ্ডবে হতাহত মানুষের আনুমানিক সংখ্যা	
	১৯৮৬ সাল	১৯৯১ সাল
বাংলাদেশ	২৭ লক্ষ	৯৮ লক্ষ
চীন	৪০ লক্ষ	১৪ লক্ষ
ভারত	৩৩ লক্ষ	১৫ লক্ষ
ফিলিপাইন্স	১২ লক্ষ	৫০ লক্ষ

সাম্প্রতিককালে ভারতের উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের ঘূর্ণবাতের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতির হিসাব নিলে আরও দেখা যায় যে, এই দুর্যোগের প্রভাবে বহু হাজার কোটি টাকার ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে যাওয়ার পর পানীয় জলের মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। কারণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পশু–পাখি, মানুষের মৃতদেহ পানিকে দূষিত করে তোলে। দূষিত পানির প্রভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং রোগের কবলেও বহুলোকের প্রাণহানি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে একদিকে যেমন প্রচুর গাছপালার ক্ষতি হয় ফলে পশু–পাখিরা তাদের স্বাভাবিক আশ্রয় হারায়। তেমনই ছোট ছোট তৃণভোজী বা মাংসাশী প্রাণীর মৃত্যুর ফলে বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শৃঙ্খল ব্যাহত হয়। শক্তি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়।

৭.৬.১. ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কারণ

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার প্রাথমিক কারণ হলো, ভূ–পৃষ্ঠের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে আকাশে ঘন কিউমুলোনিম্বাস মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী গরম বাতাস অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উঠতে থাকে এবং 'অ্যাডিয়াবেটিক' পদ্ধতিতে শীতল হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ভূ–পৃষ্ঠের উপর নিম্নচাপ বরাবর মেঘের মধ্যে আলোড়ন যত বাড়তে থাকে, ঊর্ধ্বমুখী গরম বাতাস যোগান দেওয়ায় এলাকাটি বেশ ছড়াতে থাকে। এভাবে মেঘের মধ্যে আলোড়ন যত বাড়তে থাকে, ঊর্ধ্বমুখী টানও তত বৃদ্ধি পায় এবং মেঘের মধ্যে ঘূর্ণি বাতাসের একটি দারুণ ক্ষমতাশালী নল তৈরি হয়। দূর থেকে একে হাতির শুঁড়ের মতো দেখায়। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০–২০০ কিলোমিটার। অতি উচ্চ–ক্ষমতাসম্পন্ন ঘূর্ণবাতের ক্ষেত্রে এই গতিবেগ ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি হতে পারে।

৭.৬.২. ঘূর্ণিঝড়ের প্রকারভেদ

উৎপত্তির কারণ ও স্থানভেদে একে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. **উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণি বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়:** ৬° থেকে ১৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এটি সৃষ্টি হয়। এ প্রকার ঘূর্ণিঝড়কে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হারিকেন, যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডো, চীন ও জাপানে টাইফুন বলে। বাংলাদেশে আশ্বিন–কার্তিক এবং চৈত্র–বৈশাখ মাসে এ ঘূর্ণঝড়কে কালবৈশাখী বলে।

খ. **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলীয় ঘূর্ণিঝড় :** ৩৫° থেকে ৬৫° উত্তর অক্ষাংশের স্থানসমূহে এ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এ অঞ্চলে প্রায় ৩০০ মাইল ব্যাপী এ ঘূর্ণিঝড় পরিলক্ষিত হয় এবং পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানসমূহে এ জাতীয় ঘূর্ণিঝড় পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ৬.২ : ঘূর্ণিঝড়ের নতুন সতর্ক সংকেত

নদী ও সমুদ্র বন্দরের জন্য প্রস্তাবিত সংকেত	
সংকেত	বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ঘণ্টা)
সতর্ক সংকেত–২	২০–৪০
হুশিয়ারী সংকেত–৪	৪১–৬১
বিপদ সংকেত–৬	৬২–৮৮
মহাবিপদ সংকেত–৮	৮৯–১১৭
মহাবিপদ সংকেত–৯	১১৮–১৭০
মহাবিপদ সংকেত–১০	১৭১

৭.৬.৩. ঘূর্ণিবাত বা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের উপায়

ঘূর্ণবাতকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমানো যায়। এর জন্য প্রয়োজন হয়—

১) ঘূর্ণবাত বা ঘূর্ণিঝড় আসার আগে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। এর জন্য উপগ্রহ মারফৎ খবরাখবর আদান–প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।

২) ঝড়ের আগে লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একাধিক সুব্যবস্থাযুক্ত শিবির গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৩) ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি সাহায্য ও ঋণ দানের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

৭.৭. নদী পাড়ের ভাঙন

সাধারণভাবে নদী হলো ভূ-পৃষ্ঠের উপরে একটি বহমান জলধারা। নদীর একটি উৎস আছে। অন্য কোনো বড় নদী বা সাগর বা জলাশয়ে মিলিত হওয়ার জন্য তার একটি মিলনস্থল হতে পারে বা মোহনা আছে। আর আছে নদীর একটি পরিবর্তনশীল খাত। প্রকৃতির নিয়মে নদী পর্বস্কুল এলাকায় নিম্নক্ষয় করে। ফলে নদীখাত ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়। বিপরীতভাবে সমভূমির উপরে নদী যতটা পার্শ্বক্ষয় করে, নদীখাতে গভীর করার জন্য নিম্নক্ষয় করে তার চেয়ে অনেক কম। নদীর এই পাশাপাশি ক্ষয় করার প্রবণতা নদীকে আরও প্রশস্ত বা চওড়া করে তোলে। এটি নদীর একটি অতি সাধারণ প্রকৃতি ও স্বাভাবিক ঘটনা হলেও মানুষের কাছে এটি এক বিশেষ ধরনের সমস্যা।

৭.৭.১. নদীর পাড় ভাঙনের কারণ

১) নদীর আঁকা-বাঁকা খাতের ভিতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার সময়ে অবতল বাঁকে ভাঙন ধরে এবং উত্তল বাঁকে চর সৃষ্টি করে।

২) নদীখাতের ভিতরে ঘূর্ণিস্রোত বা হেলিক্যাল ফ্লো এর প্রভাবে নদীর অবতল বাঁকের তলদেশে ক্ষয় হয়। ফলে নদীর পাড় ভেঙে পড়ে।

৩) নদীর অবতল বাঁকের নিচে ছোট ছোট ঘূর্ণির জন্য টো-ক্ষয় হয় ফলে পাড়ের নিচে তৈরি হওয়া গর্তের উপরে নদীর পাড় বেশিক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে না। এভাবে নদীর পাড় ভাঙে।

নদীর পাড় ভাঙন রোধ করার উপায় : নদীর ভাঙন রোধ করার জন্য বিভিন্ন উপায় আছে। তবে প্রতিটি উপায়ই সব জায়গার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। নদীতে পানির পরিমাণ, পানির গতিবেগ, স্রোতের চরিত্র, নদীপাড়ের মাটির বৈশিষ্ট্য, নদীর দুধারের জমি ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি না বিষয়ের উপর প্রতিরোধ বন্দোবস্ত নির্ভর করে। তবে সাধারণত নদীর ভাঙন রোধ করার জন্য যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয় তা হলো—

১) ভাঙন প্রবণ পাড় বরাবর বাঁধ ও শালের খোঁটা পর পর পুঁতে দেওয়া।

২) নদীর স্রোতের ধরন অনুসারে কংক্রিটের পাঁচিল, দেওয়াল নির্মাণ করা।

৩) আপদকলীন অবস্থায় বালির বস্তা পর পর সাজিয়ে ভাঙনের বিরুদ্ধে সাময়িক প্রতিরোধ তৈরি করা ইত্যাদি।

৭.৮. উপকূল ভাঙন বা সমুদ্রতটের ভাঙন

সমুদ্র ও স্থলভাগের সংযোগস্থলকে উপকূল বা কোস্ট বলে। উপকূলের সামনের অংশকে তটভূমি বলা হয়। এই তটভূমির উপর প্রতিদিন অসংখ্য, অগণিত ঢেউ আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের ভরা কাটলের নিম্নসীমা লেকে উপকূলের খাড়া পাড়ের নিম্নসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হলো তটভুমি। তটভূমির উপর নুড়ি, বালি প্রভৃতি সঞ্চয়ের ফলে সৈকত বা বিচ্ তৈরি হয়। যেমন কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত। তটরেখা সবসময় একই স্থানে থাকে না। সাধারণত পাঁচটি কারণে তটরেখার স্থান পরিবর্তন হয়। যথা—

১) সমুদ্রের পানির উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি

২) সমুদ্রের ক্ষয় সাধন
৩) স্থলভাগের অবক্ষেপ
৪) সমুদ্র তলদেশের অবক্ষেপ
৫) প্রবাল ও অন্যান্য প্রাণীদের প্রভাব

উপকূলের ভাঙনকে পরিবেশের সমস্যা বলে মনে করা হয় কারণ—

১) সমুদ্র সৈকতের ভাঙনের ফলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়।
২) চাষের জমি নষ্ট হয়।
৩) পর্যটন শিল্পে ক্ষতি হয়।
৪) মাছ ধরার কাজ ব্যাহত হয়।
৫) বন্দরের কাজ বিঘ্নিত হয়।
৬) সমুদ্রের লোনা পানি আশেপাশের জমিকে লবণাক্ত করে তোলে।
৭) তাছাড়া বাড়ি ঘর নিশ্চিহ্ন হয়. ফলে সামগ্রিকভাবে মানুষকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ যেহেতু পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ–এজন্য মানুষের আর্থ–সামাজিক সমস্যা পরিবেশের সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। উপকূলের ভাঙন শুধু যে মানুষেরই ক্ষতি করে—এজন্য নয় উপকূলের বাস্তুতন্ত্রেরও ক্ষতি করে। কারণ ভাঙনের ফলে বহু শত হেক্টর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বনভূমি নষ্ট হওয়ার ফলে পোকামাকড়, পশু–পাখির আবাস নষ্ট হয়। উপকূলের অগভীর সমুদ্রে মাছের খাবারে টান পড়ে। খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হয়। শক্তিপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়।

উপকূল বা সমুদ্রতটে অনেক সময়ে ভাঙন দেখা দেয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১. সমুদ্র তরঙ্গের সাথে বাহিত শিলাচূর্ণ সমুদ্রতটের উপরে ক্রমাগত ঘর্ষণ করে বলে ভাঙন দেখা দেয়।
২. উপকূল অঞ্চলে শিলার সাথে সমুদ্রজলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে শিলা দুর্বল হয়। ফলে ভাঙন দেখা দেয়।
৩. সোয়াশ (Swash) বা পশ্চাদমুখী সমুদ্রস্রোতের জন্য সমুদ্রতটে ভাঙন হয়।
৪. উপকূলের ফাটল ধরা শিলার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়লে, ফাটলের মধ্যে অবরুদ্ধ বায়ু সঙ্কুচিত হয় এবং প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। এভাবেও উপকূলের ভাঙন শুরু হয়।
৬. অনেক সময়ে উপকূলের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সমুদ্রতরঙ্গ এক জায়গায় স্থির হয়ে উঠা–নামা করতে থাকে। ফলে পাড়ের উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়। এ কারণেও ভাঙন দেখা দেয়।
৭. উপকূলের উন্মুক্ত অবস্থা, পানির গভীরতা, শিলার দৃঢ়তা বা ক্ষয় প্রতিরোধী ক্ষমতা ইত্যাদি নেতিবাচক হলেও উপকূলে ক্ষয় হয়।

৭.৯. সমুদ্রের জোয়ার–ভাঁটার পরিবেশগত গুরুত্ব

১) জোয়ারে সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদী বন্দরে প্রবেশে সুবিধা হয়।

২) ভাটার সময় নদীর সব আবর্জনা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

৩) জোয়ার–ভাঁটার টানে পলিমাটি পড়ে নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না।

৪) জোয়ার–ভাঁটার টানে নদীর পানি স্বল্প পরিমানে লবণাক্ত হয় এবং এজন্য নদীর পানি শীতে সহজে বরফে পরিণত হয় না।

৫) জোয়ারের পানি আটকিয়ে জলাধার নির্মাণ করা যায় এবং ভাটার সময় সেই পানি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

এল নিনো, লা নিনা ও দক্ষিণ দোলন বা সাউদার্ন অসিলেসন (El Nino, La Nina and Southern Oscillation) এল নিনে (El Nino) হলো দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে চিলির উপকূলে মাঝে মাঝে দেখা দেয়া অস্থির ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির উষ্ণ সমুদ্রস্রোত। এই সমুদ্রস্রোত কখন শুরু হবে বা কখন থেমে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিগত কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে যে, ডিসেম্বরের শেষে বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে এল নিনো দেখা দিয়েছে। এই সমুদ্রস্রোতের অস্থির প্রকৃতির কথা স্মরণ করে একে বিজ্ঞানীরা দুরন্ত বালকের সাথে তুলনা করেন (নিনো শব্দের অর্থ দূরন্ত বালক)।

এল নিনো কিভাবে সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। তবে এখন যে মতটি বিজ্ঞানী মহলে অনেকেই মেনে নিয়েছেন, তা হলো চিলির উপকূল বরাবর দক্ষিণ–পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে নাজকা (Nazca) নামে যে মহাসাগরীয় পাত আছে, তা দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশীয় পাতের নিচে যখন ঢুকে যায়, তখন সমুদ্রের নিচে ভূ–আন্দোলন শুরু হয়। তাপ সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে লাভা বেরিয়ে আসে। উষ্ণ লাভার সংস্পর্শে ও তাপের প্রভাবে সমুদ্রের উপরে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত দেখা যায়। সমুদ্রের নিচে কঠিন শিলার পাত কখন স্থান পরিবর্তন করবে, আগে থেকে বলা যায় না। ফলে এল নিনো কখন দেখা দেবে, তার পূর্বাভাসও আগে থেকে দেওয়া সম্ভব নয়।

এল নিনোর তীব্রতা যখন খুব বাড়ে, তখন সেই অতি উষ্ণ সমুদ্র স্রোতকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন লা নিনা (La Nina)। (নিনা শব্দের অর্থ হলো দূরন্ত বালিকা)।

এল নিনোর প্রভাবে চিলির সমুদ্র উপকূলে প্রচুর মাছ মারা যায়। প্রচুর পরিমাণে জলজ পোকা–মাকড় এবং ছোট জলজ প্রাণীও প্রাণ হারায়। ফলে সমুদ্রের এই অংশে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়। সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত হয়। জেলেদের আর্থিক ক্ষতি হয়।

এছাড়া এল নিনোর প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়। ফলে দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। উষ্ণ এল নিনোর জন্য যে নিম্নচাপ তৈরি হয় তার প্রভাবেই এই বৃষ্টিপাত ঘটে। এল নিনো যখন থাকে না, তখন বায়ু তার স্বাভাবিক উচ্চচাপ ফিরে পায়। দক্ষিণ গোলার্ধে এল নিনোর প্রভাবে বায়ুচাপের এই অস্বাভাবিক, অনিয়মিত পরিবর্তনকে বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ দোলন বা সাউদার্ন অসিলেসন (southern oscilation) বলেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

পরিবেশ দূষণ

Environment Pollution

এই পৃথিবীর সমস্ত ভৌত, অজৈব এবং জৈব উপাদানসমূহ সুদীর্ঘকাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা তৈরি করেছে, তার গুণমানের হানি হলো পরিবেশের অবক্ষয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিগত প্রায় সাড়ে চার'শ কোটি বছর ধরে সূর্যালোক, বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদান, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ ধীরে ধীরে যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বা সুষম অবস্থা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ রীতি বা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, সৌরশক্তি থেকে উদ্ভিদ পুষ্টি আহরণ করে।

তৃণভোজী প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। আবার মাংসাশী প্রাণী তৃণভোজীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। গাছের ঝরা পাতা, প্রাণীর মৃতদেহ এই পৃথিবীর বুকেই মাটির উপাদান হিসেবে আবার মিশে যায়। আর গাছপালা সেই মাটিকে আশ্রয় করে পুনরায় বেড়ে ওঠে। একের উপরে অন্যের এই নির্ভরশীলতা সেটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, একটি সুনির্দিষ্ট, সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। এর মধ্যে কোনো ছন্দপতন নেই।

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের একটি স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে আবর্জনা বা বর্জ্য শুষে নিয়ে তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করে ফেলা। পশু-পাখি ও গাছ-গাছড়ার জীবন প্রবাহের জটিল প্রক্রিয়ার নৈমিত্তিক ধারা প্রবাহে কারো জন্য যা আবর্জনা বা পরিত্যজ্য বস্তু অন্যের জন্য তাই হচ্ছে বেঁচে থাকার উপায় ও উপাদান।

একমাত্র বাস্তুতন্ত্র যখন কোনো পদার্থ পিষে বা শুষে নিয়ে তা অস্তিত্বহীন করে দিতে ব্যর্থ হয় শুধু তখনই তা দূষণে পরিণত হয়। এই বর্জ্য তখনই মানুষের স্বাস্থ্য, আবহাওয়া, খাদ্যোৎপাদন, এমনকি জীব জগতের টিকে থাকার বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল করে তোলে।

৮.১. পরিবেশের অবক্ষয় এবং দূষণের উৎস

প্রকৃতি ও মানুষের নানা কাজ পরিবেশের ক্ষতি করে।,পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি করে। পরিবেশের অবক্ষয় এবং দূষণের উৎস দুই ধরনের—এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

ক. পরিবেশের অবক্ষয় ও পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক উৎস :

১) আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2)

২) জলাভূমি অঞ্চল বা জৈব পদার্থের পচনের ফলে সৃষ্ট মিথেন (CH_4)

৩) কয়লা ও পেট্রোলিয়াম খনির মধ্যে আবদ্ধ মিথেন (CH_4), কার্বন মনো-অক্সাইড (CO), কয়লাজাত গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত গ্যাস প্রভৃতি।

৪) খাদ্যে ছত্রাকজনিত বিষাক্ত পদার্থ বা মাইকোটক্সিন

খ. পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণের অপ্রাকৃতিক উৎস বা মানুষের তৈরিকরণ :

১) অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হার

২) প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন যেমন, জলবায়ুর পরিবর্তন, মরুভূমির সম্প্রসারণ

৩) যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ

৪) ফসলের কীটপতঙ্গ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক, যেমন—ডি ডি টি জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য

৫) কৃষি জমিতে অত্যধিক সার প্রয়োগের ফলে সঞ্চিত বিষাক্ত নাইট্রেট যেমন, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বা নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড

৬) কলকারখানার আবর্জনা যথা কাগজ, কাপড়, রঙ প্রভৃতি শিল্পের অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ

৭) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উদ্ভূত পারদ বা পারদ শ্রেণীর যৌগ

৮) পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে নির্গত গ্যাস, যেমন— সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি।

৯) পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক আবর্জনা

১০) মোটর, লরি, টেম্পো, বাস প্রভৃতি পেট্রোল, ডিজেল চালিত যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস যথা— কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি

১১) সেলুনের ফোম, রঙের স্প্রে, বিমানে ব্যবহৃত এরোসল

১২) রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (SFC)

১৩) কঠিন আবর্জনা যথা, পলিথিন, প্লাস্টিকের ব্যাগ, চাদর ও এই জিনিসের তৈরি অসংখ্য সামগ্রী

১৪) শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের উড্ডয়নের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর শব্দতরঙ্গ

১৫) নর্দমার আবর্জনা এবং জীবাণু বহনকারী বর্জ্য

১৬) বাড়ির রান্নাঘর, যানবাহন ও কলকারখানা নিঃসৃত ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থ, যা সূর্যের আলোর সংস্পর্শে ফটোকেমিক্যাল স্মগ-এ পরিণত হয়

১৭) কাটা ফলমূল, উন্মুক্ত খাবার, রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত রঙিন খাদ্যদ্রব্য

১৮) লাউড স্পিকার, ঢাক, ঢোল ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে সৃষ্ট অতি উচ্চ ডেসিবলের শব্দ ইত্যাদি।

৮.২. বায়ু দূষণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (১৯৬১) মতে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অনিষ্টকর পদার্থের সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবশের ক্ষতি করে, সেই অবস্থাকে বায়ু দূষণ বলে।

৮.২.১. বায়ু দূষণের উৎস ও কারণ : বায়ুদূষণ নানাভাবে হতে পারে। এর মধ্যে কিছু প্রাকৃতিক কারণ আর কিছু মানুষের তৈরি করা কারণ। যেমন—

ক. বায়ু দূষণের প্রাকৃতিক কারণ ও উৎস

১) অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিঃসৃত সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস।

২) বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের পচনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস

৩) দাবানল, ধূলি ঝড়

৪) ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শেওলা, পরাগরেণু।

খ. অপ্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি বায়ু দূষণের কারণ

১) খনি এলাকার ধূলোবালি, ধূলিকণা, শিল্পজাত ধূলি (যেমন— ফ্লাই-অ্যাশ), কালিঝুলি ইত্যাদি।

২) দাড়ি কামানোর ফোম ও স্প্রে, বিমানে ব্যবহৃত এরোসল এবং বিভিন্ন বিষাক্ত তরল পদার্থ।

৩) যানবাহন ও কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস, যেমন, কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, হাইড্রোকার্বন ও কার্বন মনো-অক্সাইডের প্রধান উৎস হলো কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন।

৪) ব্যাপকভাবে অরণ্য ধ্বংস করার ফলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ভারসাম্যের হানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি।

৫) যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বা পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ (যেমন— পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নে চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা বা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার ধ্বংসলীলা) ইত্যাদি।

৮.২.১.১. বাতাসে সীসা দূষণ : ঢাকার বাতাসে সীসার ঘনত্ব নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে প্রতি ঘনমিটারে ৪৬৩ ন্যানোগ্রাম (খলিকুজ্জামান, ১৯৯৭) যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। ৯০ শতাংশ সীসা দূষণ হচ্ছে যানবাহনে অতিরিক্ত সীসা মিশ্রিত পেট্রোল থেকে। দেশে চিহ্নিত পেট্রোল সীসার পরিমাণ ০.৫ গ্রাম/লিটার এবং অকটেনে ০.৮৫ গ্রাম/লিটার। প্রতি বছর প্রায় ৫০ টনের মতো সীসা ঢাকার বাতাসে মিশে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইস্টার্ন রিফাইনারি-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৮.২.১.১.১. সীসা দূষণ প্রতিকার : এ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো।

১) সীসাযুক্ত পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং অকটেন ৯৬-এর পরিবর্তে ৯২ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

২) ২ স্ট্রোকবিশিষ্ট যানবাহন নিষিদ্ধকরণ

৩) পর্যায়ক্রমে যানবাহনকে CNG যানে রূপান্তর।

৪) বায়ু ছাড়া মাটি, খাদ্য ইত্যাদিতে সীসার দূষণ নির্ণয় করণে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি স্থাপন।

৫) জনসচেতনতা বাড়াতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার।

৮.২.২. মানুষের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব : বায়ু দূষণ মানুষের ক্ষতি করে। যেমন—

১) ধোঁয়াশার প্রভাবে চোখ জ্বালা করে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

২) সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

৩) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের জন্য শ্বাসকষ্ট হয়। ফুসফুসের ক্ষতি হয়। নিউমোনিয়া হওয়ার আশংকা থাকে।

৪) কার্বন মনো-অক্সাইডের জন্য রক্তের অক্সিজেন সংবহন ক্ষমতা বিঘ্নিত হয়।

৫) বেঞ্জাপাইরিনের জন্য ক্যান্সার হয়। উল্লেখ্য, রাস্তায় দেয়ার জন্য পিস গলানোর সময়ে যে ধোঁয়া বেরোয়, তাতে বেঞ্জাপাইরিনজাতীয় যৌগ পাওয়া যায়।

৬) বাতাসে ভাসমান সীসা, বালি, কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি শ্বাসনালী ও ফুসফুসের ক্ষতি করে। স্নায়ুরোগের কারণ হয়।

৮.২.২.১. ধোঁয়াশা : বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের সাথে সূর্যরশ্মির আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটলে যে ধোঁয়াটে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে ধোঁয়াশা বলে। শহরাঞ্চলে বিকালে, বিশেষত শীতকালের দিকে ধোঁয়াশার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

৮.২.২.২.বায়ু দূষণ নিবারণ : বায়ু দূষণ নিবারণের উপায় হলো— যন্ত্রপানি, কলকারখানা বা যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসকে বাতাসে ছাড়ার আগে যান্ত্রিক উপায়ে শোধন করার বন্দোবস্ত করা হলে বায়ুদূষণ রোধ করা যায়। যেমন— মোটর গাড়ির ধোঁয়া, চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর দূষিত পদার্থ থাকে। যান্ত্রিক উপায়ে এই দূষিত পদার্থসমূহকে নির্গত গ্যাস থেকে আলাদা করে নিতে হবে। এই কাজের জন্য ফিল্টার, সাইক্লোন সেপারেটর, ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটর প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা।

৮.২.৩. এসিড বৃষ্টি

বায়ু দূষণের ফলে এসিড বৃষ্টি হয়। প্রধানত কলকারখানা, যানবাহন, ধাতু নিষ্কাশন চুল্লি থেকে নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইসমূহ জমা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থসমূহ ভাসমান জলকণার সাথে বিক্রিয়া করে বৃষ্টি, শিশির, তুষারের মাধ্যমে পৃথিবীতে নেমে আসে। এইভাবে এসিড বৃষ্টি হয়। এসিড বৃষ্টির পানিতে pH ৫.৬৫ বা তার কম।

৮.২.৩.১. এসিড বৃষ্টির কারণ : বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইড (SO_X ও NO_X) বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে। সালফারের অক্সাইডগুলোর মধ্যে প্রধান

হলো সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2)। এটা বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে।

$$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$$

$$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$$

নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NO_X) সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রিক এসিড (HNO_3) উৎপন্ন করে।

$$NO + O_3 = NO + O_2$$

$$NO_2 + O_2 = NO_3 + O_2$$

$$NO_2 + NO_3 = N_2O_5$$

$$N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$$

হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) বিভিন্ন উৎস থেকে সরাসরি বায়ুতে মিশে যায়। (H_2SO_4, HNO_3, HCl ইত্যাদি সরাসরি ক্ষুদ্র জলীয় বিন্দুর আকারে অবস্থান করে এবং বৃষ্টির সাথে মিশে নিচে নেমে আসে।

৮.২.৩.২. এসিড বৃষ্টির জন্য পরিবেশের উপর প্রভাব : এ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো।

১) এসিড মিশ্রিত বৃষ্টির পানি পুকুর, হ্রদ, জলাশয়ের পানিকেও এসিডিক করে তোলে। ফলে মাছ, পোকা-মাকড়, শৈবাল মারা যায়। মাছের ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমে যায়।

২) এসিড পানির প্রভাবে হ্রদ, নদী, পুকুরের শৈবাল, পোকামাকড়, মাছ ইত্যাদি মারা যাওয়ার ফলে সেই জায়গার বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

৩) গাছপালার উপর এসিড বৃষ্টি হলে গাছের ক্ষতি হয়। যেমন, গাছের পাতা ঝলসে যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। ফলে সালোকসংশ্লেষণ বিঘ্নিত হয়। গাছের উচ্চতা কমে যায়। অঙ্কুরোদ্গম বাধা পায়। কাঠ শিল্পের জন্য ভাল কাঠের যোগান কমে যায়।

৪) এসিড বৃষ্টি মাটিকে দূষিত করে। মাটির উর্বরতা কমে যায়।

৫) এসিড বৃষ্টির প্রভাবে মার্বেল দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য বা অন্যান্য স্মারক, অট্টালিকা, প্রাসাদ এবং ধাতু নির্মিত সেতু, কলকারখানা ইত্যাদিরও বিশেষ ক্ষতি হয়। একে স্টোন ক্যান্সার বলা হয়। যেমন— বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, মথুরা তৈল শোধনাগার থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ আগ্রার তাজমহলের ক্ষতি করছে।

৬) এসিড বৃষ্টির জন্য জীবজন্তু, মানুষের ত্বক ও কোষের ক্ষতি হয়।

৮.৩. পানি দূষণ

পানির সাথে কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে পানির সেই খারাপ অবস্থাকে পানি দূষণ বলে।

পানি নানা কারণে দূষিত হয় যেমন—

১) **ঘর-গৃহস্থালীর দৈনন্দিন আবর্জনা :** মাটির ওপর দীর্ঘদিন ধরে জমা আবর্জনা থেকে তৈরি হওয়া বিষাক্ত রাসায়নিক ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু জলাশয়, মৃত্তিকা পানি ও ছোট ছোট পানিধারাগুলোকে দূষিত করে। ফলে সেই পানিতে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। পানির মধ্যে নানা ধরনের রং দেখা যায়। পানি ঘোলাটে হয়। পানিতে দুর্গন্ধ তৈরি হয়। পানির স্বাদ বদলে যায়। যেমন, অতিশয় দূষিত পানির রং লাল, মোটামুটি দূষিত পানি সবুজ ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জৈব এমাইন যুক্ত পানিতে আঁশটে গন্ধ হিউমাস যুক্ত পানিতে মাটির সোঁদাগন্ধ এবং হাইড্রোজেন সালফাইড ও ফসফরাস যুক্ত পানির পচা গন্ধ বা পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায়।

২) **শিল্পজাত আবর্জনা এবং বর্জ্য পদার্থ :** কলকারখানার ধরন অনুসারে শিল্পজাত আবর্জনাগুলোর রাসায়নিক ও ভৌত চরিত্র বদলে যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তামা, সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু, জৈব এবং অজৈব সালফার যৌগ, ফসফরাস ও ফ্লোরিনজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ কলকারখানা থেকে নিঃসৃত হয়ে পানিকে দূষিত করে।

৩) **কৃষিজাত আবর্জনা :** অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ওষুধপত্র থেকে উৎপন্ন নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ পানি দূষিত করে।

৪) **বৃষ্টির পরে নগর, শহর ও জনবসতি থেকে নির্গত ময়লা পানি :** এক পশলা বৃষ্টির পর নর্দমা, আস্তাকুঁড়, ডাস্টবিন, খাটাল, কাচা পায়খানা, শ্মশান, ভাগাড়-ধোয়া দূষিত পানির একটা বড় অংশ নদী, জলাশয় ও ভূ-পৃষ্ঠই পানিকে দূষিত করে।

৫) **ডিটারজেন্ট :** সাবানের বিকল্প হিসেবে বর্তমানে ডিটারজেন্ট অত্যন্ত জনপ্রিয়। ABS নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ (Alkyl Benzcnc Sulphonates), যা ডিটারজেন্টের অন্যতম প্রধান উপাদান, সেই রাসায়নিক দ্রব্যটি পানি দূষিত করে।

৬) **সমুদ্র পানিতে ভাসমান তেল :** খনিজ তেল এবং তেলের উপজাত দ্রব্যসমূহ সমুদ্র পানিতে বিভিন্ন কারণে ছড়িয়ে পড়তে পারে। জাহাজ ডুবি, জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ট্যাঙ্কার থেকে ছিদ্রপথে তেল চুঁইয়ে পড়া বা জাহাজে আগুন ধরে যাওয়া দুর্ঘটনা, মাঝ দরিয়ায় খালি ট্যাঙ্কার পরিষ্কার করা, মহীসোপান অঞ্চলের তৈলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনের সময় দুর্ঘটনা, সমুদ্রের তলদেশে পেতে রাখা পাইপ লাইন থেকে তেল পড়া বা যুদ্ধের সময় সমুদ্রপানিতে তেল ফেলে শত্রুর সম্পত্তি ধ্বংস করা (যেমন— ইরাক-কুয়েত ও ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সমুদ্রে তেল নষ্ট করা হয়েছিল) প্রভৃতি ঘটনার ফলে সমুদ্রপানিতে ভাসমান তেলের আস্তরণ তৈরি হয়। এতে সমুদ্রপানি শুধু যে দূষিত হয় তাই নয়, অসংখ্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মারা যায়।

৭) **তাপ দূষণ :** তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে নির্গত গরম পানি হ্রদ, নদী, খাল, বিল যেখানেই পড়ুক না কেন, সেই জলাশয়ের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব পরিবর্তন ঘটায়।

৮) এসিড বৃষ্টির ফলেও পানি দূষিত হয়।

৯) রোগজীবাণু যেমন— ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি পানিকে দূষিত করে।

৮.৩.১. জীব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা বি. ও. ডি. : জীব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা বি. ও. ডি. বলতে জলজ ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবীদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বৃদ্ধির জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাহিদা বা ক্রমহ্রাসমান অবস্থাকে বোঝায়। একে লিটার প্রতি মিলিগ্রাম এককে প্রকাশ করা হয়।

বিষয়টি কিছুটা সহজে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, পানি দূষিত হলে সেই দূষিত পদার্থকে রাসায়নিকভাবে ভেঙে দেয়া বা বিয়োজিত করার জন্য ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণু, অর্থাৎ অণুজীবী প্রয়োজন। আমরা জানি যে, পানি যত দূষিত হবে ততই সেই পানিতে ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়বে এবং তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য বা দূষিত পদার্থকে পচিয়ে ফেলার জন্য তখন দরকার হয় অতিরিক্ত অক্সিজেন। সুতরাং দূষিত পানিতে জীবাণুর সংখ্যা যত বাড়বে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ কমবে। সেই কারণে পানি কতটা দূষিত হয়েছে, তা বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনেব জীব–রাসায়নিক চাহিদা মেপে দেখেন।

বি. ও. ডি–এর মাত্রা অনুসারে পানির উৎকর্ষতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (BOD-1) খুব ভালো পানি ; (BOD-3) মোটামুটি ভালো পানি ; (BOD-10) দূষিত পানি ; (BOD-20) খুব দূষিত পানি ইত্যাদি।

৮.৩.২. অতিপৌষ্টিকতা : গ্রিক শব্দ *eutrophy* থেকে ইংরেজি ইউট্রোফিকেশন (eutrophication) কথাটি এসেছে—যার অর্থ অতিপৌষ্টিকতা। অতিরিক্ত জৈবপদার্থ জলাশয়ে জমা হয়ে যখন এসব ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে পানিতে খনিজ আয়নের অতিবৃদ্ধি ঘটায়—যার ফলে শেওলা, আগাছা ও পানীয় জলাশয় ঢাকা পড়ে। একপ্রস্থ জলজ শেওলার মৃত্যুর উপর আর এক প্রস্থ নতুন করে জন্মে। মৃত জীবসমূহের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচন ঘটে। এই পচনকালে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তা জলজ প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

অতিপৌষ্টিকতা হলো হ্রদের তলদেশে জৈব পদার্থ ক্রমাগত জমা হওয়ার ফলে হ্রদ ভরাট হওয়ার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে হ্রদ মজে গিয়ে অগভীর জলাভূমিতে পরিণত হয়। বড় পুকুরও অতিপৌষ্টিকতার জন্য ডোবায় পরিণত হতে পারে।

৮.৩.৩. মানুষ ও পরিবেশের উপর পানিদূষণের প্রভাব : নিচে মানুষ ও পরিবেশের উপর পানি দুষণের প্রভাব উল্লেখ করা হলো—

ক. **মানবদেহে পানি দূষণের প্রভাব :** এ সম্বন্ধে নিচে উল্লেখ করা হলো—

১) দূষিত পানি থেকে টাইফয়েড, জন্ডিস, আমাশয়, কলেরা, পেট খারাপ, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, চর্মরোগ, আর্সেনিক দূষণ প্রভৃতি রোগ মহামারির আকার ধারণ করতে পারে।

২) অ্যাসবেস্টসজাতীয় রাসায়নিক পদার্থে দূষিত পানি থেকে অ্যাসবেসটোসিস, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

৩) তামা, ক্লোরিন, পারদ, নিকেল, লোহা, সায়ানাইড মিশ্রিত পানি থেকে চর্মরোগ ও পেটের অসুখ দেখা দেয়।

৪) পানি শোধন করার সময় ফ্লোরিনের অতিরিক্ত ব্যবহার পানিকে দূষিত করে ফেলে এবং পানি থেকে অ্যালার্জি, কিডনির সমস্যা, প্যারালাইসিস, হাড়ের বিকৃতি প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে।

খ. **মাটির উপর পানি দূষণের প্রভাব :** দূষিত পানি দিয়ে কৃষি কাজ করা হলে—

১) ব্যাকটেরিয়া ও মাটির মধ্যে বসবাসকারী জীবাণুর ক্ষতি হয়। এতে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

২) দূষিত মৃত্তিকা পানি মাটিতে ক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

৩) দূষিত পানিতে বিশেষ করে আর্সেনিক দূষিত হলে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। এই দূষণ খাদ্য শৃংখলের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে, ফলে শস্যের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

গ. **সামুদ্রিক পরিবেশের উপর দূষিত পানির প্রভাব**

১) সমুদ্র পানিতে ভাসমান তেলের আস্তরণ সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে এবং মাছের উৎপাদন কমে যায়।

২) দূষিত পানির প্রভাবে জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়। যেমন— ন্যাপথালিন, ফেনানথ্রিন, বেঞ্জোপাইরিন ইত্যাদি।

৩) পানি দূষণের জন্য আঞ্চলিকভাবে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়।

ঘ. **পাখিদের উপর পানি দূষণের প্রভাব :** দূষিত পানিতে বসবাসকারী মাছ, পোকামাকড় ইত্যাদি খেয়ে পাখিরা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা সচরাচর নজরে আসে না। তবে সমুদ্রপানিতে ভাসমান তেল থেকে হাজারে হাজারে পাখি যেভাবে মারা পড়ে, আর কোন কারণে পাখিদের মধ্যে এমন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখা যায় না। পানিতে ভাসমান তেল পাখির পালকে, ডানায় জড়িয়ে যাওয়ার ফলে পাখিরা ওড়ার ক্ষমতা হারায়। পালকের পানিরোধী ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ফলে পানির সংস্পর্শে পাখিদের শারীরিক উষ্ণতা হ্রাস পায় এবং পাখিরা মারা যায়। এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হাইপোথারমিয়া বলে।

৮.৪. আর্সেনিক দূষণ

আর্সেনিক (পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩, ওজন ৭৪.৯৪) প্রকৃতিতে মুক্ত মৌল হিসেবে পাওয়া যায় না। অক্সিহাইড্রেট, সালফাইড এবং আর্সেনেট যৌগ হিসেবে এটি প্রকৃতিতে বিদ্যমান। প্রকৃতিতে ২০০টির বেশি আর্সেনিক যৌগের উপস্থিতির বিষয়টি জানা যায়, যার মধ্যে তিনটিকে আকর হিসেবে গণ্য করা হয়।

অতিরিক্ত আর্সেনিক যুক্ত হয়ে পানি বা মাটি দূষিত হওয়াকে আর্সেনিক দূষণ বলে। তবে আর্সেনিক দূষণের কথায় সাধারণভাবে পানি দূষণের বিষয়টি আগে এসে যায়। আর্সেনিক একটি মৌল। ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক বিভিন্ন বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরি করতে পারে। আর্সিন গ্যাস, আর্সিনাইট্স, আর্সেন অক্সাইড, আর্সিনেট্স ইত্যাদি যৌগসমূহ উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি করে। মাটির সাথে অতিরিক্ত আর্সেনিক যুক্ত হলে মাটি দূষিত হয়। তেমনি পানির সাথে আর্সেনিক মিশে পানিকে দূষিত করে তোলে। ১৯৮৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত হয় আর্সেনিক দূষণ এবং ১৯৯৩ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাংলাদেশে।

বিষাক্ত এবং ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও আর্সেনিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

১) কৃষিকাজে কীটনাশক হিসেবে

২) কাষ্ঠ শিল্পে কাঠ সংরক্ষক রাসায়নিক উপাদান হিসেবে

৩) ওষুধ শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প, রঙ উৎপাদন, সাবান উৎপাদন, ব্যাটারি তৈরি, কাচের সামগ্রী উৎপাদন ইত্যাদি কাজে।

৪) পশুপালনের কাজে রোগ নিবারণকারী উপাদান হিসেবে ইত্যাদি।

৮.৪.১. আর্সেনিক দূষণের কারণ : ভূ-তাত্ত্বিকভাবে সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী জানান অতিমাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণের কারণে ভূ-অভ্যন্তরে অক্সিজেন প্রবেশের ফলে পানিবাহী শিলাস্তরের আর্সেনোপাইরাইট জারিত হয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে তরল অবস্থায় যুক্ত হচ্ছে। অপরদিকে ব-দ্বীপ পলল ও নদীবাহিত পলল সমভূমির পলি সঞ্চায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন উৎস হতে আর্সেনিকযুক্ত পলি ব-দ্বীপ ও পলল সমভূমি অঞ্চলে জমা হয় যেখানে আর্সেনিকের বাহক হলো প্রধানত আয়রন অক্সি-হাইড্রোক্সাইড নামের একটি মিনারেল। পরবর্তীতে পলির সঙ্গে সঞ্চিত জৈব পদার্থ কর্তৃক অক্সিজেন আহরণের ফলে পানিবাহী শিলাস্তরে বিজারিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময় বিজারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়রন অক্সি-হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে সংযোজিত, আর্সেনিক ও আয়রন ভূ-গর্ভস্থ পানিতে তরল অবস্থায় যুক্ত হয়।

৮.৪.২. মানুষের উপর আর্সেনিক দূষণের প্রভাব

ক. প্রাথমিক পর্যায়

১) চামড়ার রং কালো হয়ে যাওয়া (মেলানোমিনম)

২) চামড়া শক্ত ও খসখসে হয়ে যাওয়া (কেরাটোশিস)

৩) চোখ লাল হয়ে যাওয়া (কনজাংটিভাইটিস)
৪) শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ (ব্রংকাইটিস)
৫) বমি বমি ভাব ও পাতলা পায়খানা (গ্যাস্টোএনটেবাইটিস)

খ. দ্বিতীয় পর্যায়

১) ত্বকের বিভিন্ন স্থানে সাদা কালো দাগ (লিউকো-মেলানোসিস)
২) হাতে ও পায়ের তালুতে শক্ত গুটি (হাইপার কেরাটোসিস)
৩) পা ফুলে যাওয়া (নন পিটিং ইডেমা)
৪) প্রান্তীয় স্নায়ুরোগ (পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি)
৫) কিডনি ও লিভারের জটিলতা।

গ. তৃতীয় পর্যায়

১) দেহের প্রান্তদেশীয় অঙ্গের পচন (গ্যাংগ্রিন)
২) ত্বক, মূত্রথলী ও ফুসফুসের ক্যান্সার
৩) লিভারের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া।
৪) কিডনির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া।

৮.৫. শব্দ দূষণ

অবাঞ্ছিত শব্দ মানুষের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। সে কারণে কোলাহল বা অতিরিক্ত অবাঞ্চিত শব্দ দূষণের পর্যায়ে পড়ে। মানুষের সহন ক্ষমতা বা শ্রুতিসীমার অতিরিক্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ, অবাঞ্চিত, কর্কশ এবং বেসুরের অস্বস্তিকর শব্দকে শব্দদূষণ বলে। এর ফলে মানুষের শরীরে নানাধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন, মানুষ বধির হয়ে যায়। রক্তচাপ বাড়ে। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের গোলযোগ দেখা দেয় ইত্যাদি।

৮.৫.১. শব্দ দূষণের কারণ : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ নিজেই শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। শব্দ দূষণের দুটি কারণ আছে, যথা—

ক. প্রাকৃতিক কারণ যেমন বজ্র পড়ার শব্দ

খ. মানুষের তৈরি কারণ যেমন— যান চলাচলের তীব্র শব্দ, ট্রেনের হুইসেল, গাড়ির হর্ন, মাইকের শব্দ, জেনারেটর চলার শব্দ, কলকারখানার মেশিন চলার শব্দ, সাইরেন, আতশবাজির শব্দ, সুপারসনিক জেট বিমানের শব্দ, মিটিং-মিছিলে বহু লোকের একসাথে কথা বলার শব্দ ইত্যাদি।

শব্দ দূষণ পরিমাণের একটি বহুল প্রচলিত একক হলো ডেসিবেল। বেল কথাটি বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেলের নামানুসারে গৃহীত। সংজ্ঞা অনুসারে শব্দ এবং প্রমাণ শব্দের তীব্রতার অনুপাতে লগ-কে বেল বলে। এক ডেসিবেল = ০.১ বেল। অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা এবং প্রমাণ শব্দের প্রাবল্যের ১০ লগকে ১ ডেসিবেল বলে।

$$\text{সূত্র অনুসারে এক ডেসিবেল (dB)} = ১০ \text{ Log } \frac{\text{শব্দের তীব্রতা}}{\text{প্রমান শব্দের তীব্রতা}}$$

সারণি ৮.১ : বিভিন্ন উৎস থেকে আগত শব্দের তীব্রতা

উৎস	তীব্রতা
নিশ্বাস-প্রশ্বাস	১০
ফিস্‌ফিস আওয়াজ	২০–৩০
লাইব্রেরি	৩০–৩৫
মোটর সাইকেল	১০৫
সাইরেন	১০৫
জেট প্লেন	১০০–১১০
লাউড স্পিকার	১১০

৮.৫.২. শব্দ দূষণের প্রভাব : শব্দ দূষণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব মানুষের পক্ষে একেবারে ভালো নয়। শব্দদূষণের প্রভাবে মানুষের শরীরে এবং মানসিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়। যেমন—

১) মানুষের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়
২) মানসিক অবসাদ বৃদ্ধি পায়
৩) মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং অকারণে বিরক্তি আসে
৪) শ্রবণেন্দ্রিয় খারাপ হয় এবং শ্রবণে বাধার সৃষ্টি হয় কান বধির হয়ে যায়
৫) শ্বাস-প্রশ্বাসের হার অস্বাভাবিক হয়
৬) স্মৃতিশক্তি কমে যায়
৭) ঘুম কমে যায়
৮) মাথা ঝিমঝিম করে, বমিভাব আসে, স্নায়ু উত্তেজিত হয়
৯) হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ে বা কমে
১০) শব্দ দূষণে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি বাসস্থান ত্যাগ করে—যার ফলে বাস্তুতন্ত্রে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে

শব্দদূষণ তিনভাবে প্রতিরোধ করা যায়। যেমন— (ক) প্রযুক্তিগত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, (খ) আইনগত উপায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (গ) ব্যক্তিগত এবং জনশিক্ষার মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

ক. প্রযুক্তিগত উপায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

১) কারখানা বা শিল্পসংস্থায় কর্কশ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতির প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটিয়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একে উৎসস্থলের শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বলে। এছাড়া কলকারখানাসমূহ আবাসিক এলাকার বাইরে স্থাপন করা উত্তম।

২) যেসব যন্ত্রপাতি থেকে অবাঞ্ছিত শব্দ তৈরি হয় সেই ধরনের যন্ত্রপাতির উপর শব্দ প্রতিরোধ আচ্ছাদন ব্যবহার করেও শব্দ দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

৩) যেসব জায়গায় ৮০ (ডেসিবেল) এর বেশি শব্দ সৃষ্টি হয় সেখানে অবাঞ্ছিত শব্দ প্রতিরোধ করার জন্য ইয়ার প্লাগ dB কানাল ক্যাপ, ইয়ার মাফ ব্যবহার করা দরকার।

৪) যেসব কলকারখানায় প্রচণ্ড শব্দ হয় সেখানে দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য শব্দ প্রতিরোধী এলাকা (Acoustic zone) তৈরি করার প্রয়োজন হয়।

৫) হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে।

খ. আইনগত উপায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

ব্যক্তিগত উপায়ে নানাভাবে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন—

১. স্কুটার, মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ি প্রভৃতি যানবাহন চালানের সময়ে অথযা হর্ন দেওয়া বন্ধ করলে শব্দ দূষণ কমে।

২) রাস্তার দুপাশে গাছপালা লাগিয়ে শব্দ দূষণমুক্ত এলাকা গড়ে তোলা যায়। একে গ্রিন মাফলার বলা হয়।

৩) আতশবাজি পোড়ানো বন্ধ করা হলে তীব্র শব্দ করা, বোমা, পটকা ফাটানো বন্ধ হয়। এভাবেও শব্দ দূষণ কমে।

৪) বিয়ে, জন্মদিন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত আনন্দ-অনুষ্ঠানে ৬৫ ডেসিবল-এর নিচে মাইক চালানো হলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫) শব্দ দূষণের খারাপ দিকগুলো ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনকে ঠিকমত বোঝাতে পারলে শব্দ দূষণের তীব্রতা কমে।

৬) জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে শব্দ দূষণ কমানো যায়।

৭) ট্রাফিক সপ্তাহ পালনকালে শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা।

৮.৬. কীটনাশকের দূষণ

যে জৈব রাসায়নিক উপায়ে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ মারার সাথে সাথে পানি, মাটি, বাতাস, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের শারীরিক ক্ষতি করা হয়, তাকে কীটনাশক দূষণ বলে।

৮.৬.১. কীটনাশক দূষণের উৎস : কীটনাশক দূষণের উৎসগুলো হলো— ১. ডিডিটি, ২. টক্সাফিন, ৩. লিন্ডেন, ৪. অলড্রিন, ৫. এনড্রিন, ৬. ডায়েলড্রিন, ৭. মাইরেক্স, ৮. এন্ডো সালফান প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য।

৮.৬.২. কীটনাশক দূষণ প্রতিরোধ ও জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি : কীটনাশক দূষণ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল উপায় হল পতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন শত্রু খাদক ও পরজীবীর সাহায্য নিয়ে অবাঞ্ছিত কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন— অস্ট্রেলিয়ার লেডি বার্ড বিটল পতঙ্গের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেবুর ক্ষেত ধ্বংসকারী

কটনি কুশন স্কেল নামক পতঙ্গটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। কীট–পতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সুবিধা হলো—

১) একটি নির্দিষ্ট পতঙ্গের সংখ্যা এই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্য উপকারী পতঙ্গের কোনো ক্ষতি হয় না। ফলে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হয় না।

২) মাটির মধ্যে অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত রাসায়নিক যুক্ত হতে পারে না। ফলে মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩) মাটির মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন অণুজীবীদের কোনো ক্ষতি হয় না।

৪) পরজীবী ও শত্রু খাদকের একবারে বেশি প্রয়োগ করতে হয় না। একবার ব্যবহার করলেই তারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের সাথে অভিযোজিত হয়।

৫) ছোট এলাকার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট পতঙ্গের বিরুদ্ধে শত্রু পতঙ্গ ছেড়ে দিলে সেই শক্তিশালী খাদক পতঙ্গ বড় এলাকা জুড়ে নিজেরাই ছড়িয়ে পড়ে।

৬) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করলে পানি, বায়ু ও জীবের দেহে কোনো বিপরীত ক্ষতিকর প্রভাবের আশংকা থাকে না।

ভালো কীটপতঙ্গের অনেক সময়ে শত্রু পতঙ্গ মেরে ফেলার অসুবিধা রয়েছে। যেমন—

১) আপাতদৃষ্টিতে ভাল কীট–পতঙ্গ অনেক সময়ে শত্রু পতঙ্গকে মেরে ফেলার পর নিজেরাই অন্য কোনো শস্যের ক্ষতিকর পতঙ্গে পরিণত হতে পারে।

২) যেসব কীটপতঙ্গকে শত্রু পতঙ্গের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা হবে, তারা যেন সেই নির্দিষ্ট পতঙ্গকেই আক্রমণ করে, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। নচেৎ অন্যান্য পোকামাকড়ও যদি এরা ধ্বংস করতে শুরু করে তা হলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

৮.৭. তেজস্ক্রিয় দূষণ

প্রকৃতিতে কিছু মৌল নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে আলফা কণা, বিটা কণা ও গামা রশ্মি নামে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করে। এটি পরিবেশের স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু অনেক সময়ে এই কণা ও তরঙ্গ অতি অল্প সময়ে এত অস্বাভাবিক মাত্রায় বেশি তৈরি হয় যে, তা পরিবেশের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। একে তেজস্ক্রিয় দূষণ বলে।

৮.৭.১. তেজস্ক্রিয় দূষণের উৎস : প্রাকৃতিক পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার কয়েকটি উৎস আছে। যেমন—

ক. মহাজগতিক রশ্মি থেকে বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। যথা— কার্বন ১৪, ট্রাইটিয়াম।

খ. মহাদেশ ও মহাসাগরের বিভিন্ন শিলার মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) ইউরেনিয়াম–রেডিয়াম শ্রেণী, ও (২) ইউরেনিয়াম–অ্যাকটিয়াম শ্রেণী।

বারিমণ্ডলে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ হলো— রেডন-২২২, রেডিয়াম-২২৬, রেডিয়াম-২২৮ ইত্যাদি। অন্যদিকে শিলামণ্ডলে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫, বেরিয়াম-১৪২, ক্রিপ্টনট্র-৯১, ল্যান্থানিয়াম-১৪২ অন্যতম।

এ ছাড়া মানুষের তৈরি কয়েক ধরনের অবস্থা আছে, যেখানেও তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন (১) খনি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ খনন করার সময়, (২) পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সময়, (৩) ঘড়ি শিল্পে (ঘড়িতে রেডিয়াম এর ব্যবহার), (৪) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করার সময়ে ইত্যাদি।

৮.৭.২. হাসপাতাল বর্জ্য : হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্লিনিক থেকে যেসব বর্জ্য পাওয়া যায়, সেসব বর্জ্যের মধ্যেও পরিবেশ দূষিত হয়। হাসপাতাল বর্জ্য সাধারণত নিম্নলিখিত দু'ধরনের হয়ে থাকে যথা—

১) তরল বর্জ্য

ক. জীবাণুঘটিত বর্জ্য—রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

খ. রাসায়নিক বর্জ্য—বিভিন্ন দ্রবণ, অজৈব লবণ।

গ. মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ—অব্যবহৃত ওষুধ।

ঘ. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য-তাপ, রঞ্জনরশ্মি উদ্ভূত বর্জ্য (আয়োডিন ১২৫ ও ১৩১)

২) কঠিন বর্জ্য

ক. অস্ত্রোপচারজনিত বর্জ্য—সূঁচ, সিরিঞ্জ, ব্লেড ইত্যাদি।

খ. বিবিধ বর্জ্য—ড্রেসিং সরঞ্জাম ইত্যাদি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ৮৫% বর্জ্য বিপদজ্জনক নয়, ১০% সংক্রমণের এবং ৫% বিপদজনক তবে সংক্রামক নয়। এ বর্জ্য ইনসেনারেটরে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা না থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা এক শ্রেণীর টোকাইদের মাধ্যমে কুড়িয়ে পুনঃব্যবহার করছে। ফলে এরা বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরিবেশও হচ্ছে বিপন্ন।

৮.৭.৩. মানুষ ও পরিবেশের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব : মানুষ ও পরিবেশের উপর অস্বাভাবিক হারে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেমন—

১) আয়োডিন ১৩১-এর প্রভাবে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দেয় এবং টিউমার, ক্যান্সারের জন্ম দেয়।

২) স্ট্রানিয়াম ১৯০-এর কারণে রক্তে ক্যান্সার হতে পারে।

৩) সিজিয়াম ১৩৭-এর জন্য শারীরবৃত্তীয় প্রণালী বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে।

তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন মানুষের জন্য কিছুটা আলাদা। যেমন-- ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেকশন (International Commission on Radiological Protection) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী—

ক) শিশু, কিশোর-৫ রেম

খ) গর্ভস্থ ভ্রূণ-৩ রেম

গ) বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের সম্পূর্ণ জীবনকাল-২০০ রেম।

৮.৮. পারমাণবিক শক্তি ও নিরাপদ পরিবেশ

সস্তার প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আজকাল বহু দেশেই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কারণ মাত্র ১০০ গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে প্রায় ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। অন্যদিকে এর সমপরিমাণ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদন করতে হলে প্রায় ১৩৫০ মেট্রিক টন কয়লা লাগে। কয়লা বা খনিজ তেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে এমনিতেই কোনো সুবিধা নেই। তবে অসুবিধা হলো যে, সারা পৃথিবী জুড়ে কয়লা ও খনিজ তেলের ভাণ্ডার ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ক্লাব অফ রোম নামে একটি গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী মেডোস দেখিয়েছেন যে, সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে হারে কয়লা খরচ করা হচ্ছে, তাতে আগামী ২৩০০ বছরের মধ্যে সব কয়লা শেষ হয়ে যাবে। এদিকে জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, ফলে কয়লার ব্যবহারও ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধির হারকে যদি হিসেবের মধ্যে ধরা হয় তবে সারা পৃথিবীতে কয়লার আয়ু আর মাত্র ১৫০ বছর। খনিজ তেলের অবস্থা আরো ভয়াবহ। মেডোসের হিসাব মতো পেট্রোলিয়ামের আয়ু আর মাত্র ৫০ বছর। কিন্তু মানুষ নিজে তো আর আগামী ১৫০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে না। তা হলে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ছাড়া আগামী দিনে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হবে।

এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা বাতাস, সৌরশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন। তবে পারমাণবিক শক্তি থেকে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায় না। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানি, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে পারমাণবিক চুল্লি বসানো হয়েছে।

কিন্তু চের্নোবিলের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করার বিপদ অনেক। পারমাণবিক চুল্লির বিস্ফোরণ আণবিক বোমা ফাটানোর মতোই সমান বিপজ্জনক। এই ধরনের দুর্ঘটনায় আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বায়ুমণ্ডলকে বহু বছরের জন্য বিষাক্ত করে তোলে। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে যে শিশু জন্মাবে তারা অনেকেই বিকলাঙ্গ হবে। তাই জার্মানিতে ২০০০ সালের জুন মাস থেকে তাদের দেশে সব পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নবম অধ্যায়

পরিবেশ : সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

Environment : Conservation and Development

সংরক্ষণ হলো যা অপ্রতুল অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় যে জিনিসের যোগান অল্প, ভবিষ্যতের জন্য তার কিছুটা সঞ্চয় করে রাখা।

পরিবেশের উপাদানসমূহকে দূষিত না করে, তাদের ভারসাম্য নষ্ট না করে, সামগ্রিকভাবে পরিবেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার উপায় বা পদ্ধতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বলে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার আন্দোলন করে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়।

যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিতভাবে পরিবেশের মধ্যে অনুকূল অবস্থা তৈরি করে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সুরক্ষিত করা যায় ও প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া যায়— এক্ষেত্রে সে পদ্ধতিকেও সংরক্ষণ করা বোঝায়। তবে কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদকে পুনরুদ্ধার করা যায় না, যেমন— কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি।

৯.১ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী হলো সেসব জীবজন্তু যারা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে নিজেদের মতো পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে বসবাস করে। এদের মানুষ পোষ মানায় নি বা তারা পোষ মানে নি। যেমন–– তিমি, গণ্ডার, চিতা, সাম্ভার, কুমির, শকুন, পেঁচা ইত্যাদি। তবে এরা গৃহপালিত প্রাণী নয় বলে পরিবেশের কাছে এসব জীবজন্তুর কোনো প্রয়োজন নেই তাও নয়। এদের উপকার মানুষ সরাসরি বুঝতে পারে না বলে এদের শিকার করে আনন্দ পায়। এদের অবহেলা করে। একটা উদাহরণ দিয়ে বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, পৃথিবী থেকে সমস্ত বাঘ আর সিংহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাহলে তাদের খাদ্য হিসেবে হরিণ, মোষ, জেব্রা ইত্যাদি তৃণভোজীদের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকবে। ফলে তৃণভোজীরা বনের ঘাসপাতা খেয়ে শেষ করে লোকালয়ে হানা দেবে, শস্য নষ্ট করবে। আর উদ্ভিদের অভাবে অক্সিজেনের যোগান কমবে। মাটিতে জৈব পদার্থের যোগান কমবে। বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে।

৯.১.১. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা : এ বিষয়ে বর্ণনা করা হলো—

১) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান অটুট রাখা যায়। যেমন— হরিণ সংরক্ষণ করলে বাঘের বা জেব্রা সংরক্ষণ করলে

সিংহের খাবারে টান পড়ে না। উল্লেখ্য, এসব বন্যপ্রাণীর খাবারে টান পড়লেই তারা খাদ্যের খোঁজে মানুষের বসতিতে হানা দিয়ে প্রভূত ক্ষতি করবে।

২) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে অক্সিজেনের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। যেমন, তিমি মাছ সমুদ্রে ক্রিল নামে চিংড়ির মতো এক ধরনের পোকা খায়। আর ক্রিল সমুদ্রের সবুজ শৈবাল খায়। একটা তিমি গড়ে প্রতিদিন ২ টন ক্রিল খায়। সুতরাং তিমি মাছ মেরে ফেললে সমুদ্রে কোটি কোটি টন ক্রিল বেড়ে যাবে আর তারা সবুজ শৈবাল খেয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। তাহলে সবুজ শৈবাল সালোকসংশ্লেষণ করে প্রকৃতিতে অক্সিজেন যোগান দিতে পারবে না। তখন অক্সিজেনের অভাবে সামুদ্রিক প্রাণী এমনকি মানুষের জীবনও বিপন্ন হবে।

৩) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে খাদ্য–শৃঙ্খল অটুট রাখা যায়। যেমন— সবুজ উদ্ভিদকে খায় ঘাসফড়িং। ঘাস ফড়িংকে খায় ব্যাঙ। ব্যাঙকে খায় সাপ। সুতরাং সাপ সংরক্ষণ করলে প্রকৃতিতে ব্যাঙের সংখ্যা বাড়বে না। ব্যাঙের সংখ্যা না বাড়লে ঘাসফড়িং–এর সংখ্যা বাড়বে না। ঘাসফড়িং এর সংখ্যা না বাড়লে ঘাসপাতা আগাছার পরিমাণও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে না।

৪) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীব বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

৫) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে বাস্তুতন্ত্রকে অটুট রাখা যায়। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে।

৬) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবজন্তুর বাসভূমি অটুট রাখা যায়।

৭) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে লুপ্তপ্রায় জীবজন্তুকে রক্ষা করা যায় যেমন, কৃষ্ণসার হরিণ, লজ্জাবতী বাঁদর, তুষার চিতা, ধনেশ পাখি ইত্যাদি।

৮) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে পর্যটন শিল্প গড়ে তোলা যায়।

৯) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে জীবজন্তু সম্বন্ধে গবেষণা করা যায় এবং নানামাত্রিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

১০) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করে জীবজন্তুর নিজস্ব পরিবেশে তাদের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখা যায়।

৯.১.২. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পদ্ধতি : নিম্নলিখিত উপায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা যায়।

১) বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণের জন্য তাদের বাসভূমি চিহ্নিত করতে হবে বা কৃত্রিম বাসভূমি তৈরি করতে হবে। এই বাসভূমি অনেক ধরনের হতে পারে, যেমন— ক. অভয়ারণ্য, খ. জাতীয় বনভূমি (national park), গ. সংরক্ষিত বন (reserve forest), ঘ. পাখিরালয় (bird sanctuary), ঙ. ব্যাঘ্র প্রকল্প (tiger project), চ. মৃগ উদ্যান (deer park), ছ. কুমির সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রকল্প (Crocodile Conservation Research Project), জ. চিড়িয়াখানা বা পশু উদ্যান (zoo gardens)।

২) অভয়ারণ্যে বা সংরক্ষিত বনভূমিতে চোরা শিকার ও কাঠের চোরা কারবার বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ অভয়ারণ্যে গাছ লাগাতে হবে। জলাশয় তৈরি করতে হবে।

৩) অভয়ারণ্যের জীবজন্তুদের খাদ্য ও জলের যোগান যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেজন্য গাছ লাগাতে হবে ও জলাশয় তৈরি করতে হবে।

৪) জীবজন্তুর রোগ হলে সারানোর জন্য পশু চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখতে হবে।

৫) অভয়ারণ্যের কাছাকাছি বড় জনবসতি ও কলকারখানা স্থাপন করা চলবে না।

৬) বন্যপ্রাণী আইন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে ও আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) বন্যপ্রাণী বিষয়ে গবেষণা করে যেতে হবে ও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

৯.২. জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ

জার্মপ্লাজম অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণসম্পন্ন প্রজাতির প্লোটোপ্লাজমযুক্ত কোষ বা কোষসমষ্টিকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ,

১) জনসংখ্যা যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে, তাতে প্রতিদিনই আরও বেশি করে খাদ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় কৃষকের দরকার হলো অধিক উৎপাদনশীল বা উচ্চফলনশীল বীজ। আর তার জন্য প্রয়োজন উচ্চফলন গুণসম্পন্ন শস্য প্রজাতির কোষ। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ছাড়া এ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়।

২) খাদ্যশস্য বেশি করে উৎপাদন করা ছাড়াও মানুষের দরকার দুধ, মাছ, ডিম, মাংস ইত্যাদি। তাই দুধের উৎপাদন বাড়াতে হলে যেমন সঙ্কর জাতের গরু প্রয়োজন, তেমনি মাছ, ডিমের ফলন বাড়ানোর জন্য দরকার উন্নত প্রজাতির মাছ, মুরগি, হাঁস ইত্যাদি। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করে এই কাজ করা যায়।

৩) জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে পারলে বিবর্তনের ধারা অক্ষুণ্ন রাখা যায়। আজ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে এবং প্রতিনিয়ত অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করে এদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

৪) বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে রোগ, পোকা, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা আছে। জার্মপ্লাজমের সাহায্যে এই উদ্ভিদসমূহের জিনকে ধান, গম, ভুট্টা, সবজি, ফল, ফুলের গাছের জিনের সাথে সংযোজন করতে পারলে, ধান, গম, সবজির রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মাবে। গাছপালা সহজেই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার কমবে। এর ফলে পরিবেশ দূষণও কমবে।

৯.৩. অভয়ারণ্য

অভয়ারণ্য বলতে সেসব সংরক্ষিত বনভূমিকে বোঝায় যেখানে কিছু বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করে। ভারতে ৪২১টি অভয়ারণ্য আছে। পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরের আইন অনুযায়ী অভয়ারণ্যের সম্পদ নষ্ট করা যায় না। তবে জনসাধারণ অভয়ারণ্যের কিছু কিছু জায়গায় অনুমতি নিয়ে বিনোদন করতে পারে। অভয়ারণ্যের সাহায্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা যায় ও জনসাধারণকে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে সচেতন করা যায়।

৯.৩.১. জাতীয় উদ্যান : জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক বলতে সেসব অঞ্চলকে বোঝায় যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহ সব ধরনের গাছপালা ও জীবজন্তুকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার এ্যান্ড নেচারাল রিসোর্সেস (IUCN) –এর উদ্যোগ সারা পৃথিবীর এক'শ–র বেশি দেশে জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। জাতীয় উদ্যানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেশের সরকারের। ভারতে মোট ৭৫টি জাতীয় উদ্যান আছে। এদের মধ্যে উত্তর প্রদেশে করবেট ন্যাশনাল পার্ক সবচেয়ে পুরোনো। ১৯৩৫ সালে এটি গড়ে তোলা হয়। আগে এর নাম ছিল হেইলি ন্যাশনাল পার্ক।

জাতীয় উদ্যান গঠনের উদ্দেশ্য হলো বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ন রাখা, জনসাধারণকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করা।

৯.৩.২. ব্যাঘ্র প্রকল্প : স্বাভাবিক পরিবেশে বাঘকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে ব্যাঘ্র প্রকল্প বলে। সারা ভারতে বর্তমানে ২১টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪৩০০টি বাঘ আছে। ভারত, চীন, সাইবেরিয়া ও মালয়ের দ্বীপগুলোতে বাঘ পাওয়া যায়। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে নির্বিচারে বাঘ শিকার করার ফলে বাঘের সংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে মারাত্মকভাবে কমে গেছে। এজন্য বাঘকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

বিজ্ঞানী জন স্পার্কস ১৯৭১ সালে তাঁর এনিম্যাল ইন ডেঞ্জার গ্রন্থে বলেছেন যে, একটা বাঘকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে হলে তার ৭৭.৭ বর্গকিলোমিটার জায়গা লাগে। সেই হিসেবে সুন্দরবন, করবেট ন্যাশনাল পার্ক, রণথমবোর প্রভৃতি ব্যাঘ্র প্রকল্পে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম জায়গা আছে।

৯.৩.২.১. বাঘ সংরক্ষণে দশ দফা ঢাকা ঘোষণা : ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্লোবাল টাইগার ফোরাম–এর তিনদিনব্যাপী প্রথম সাধারণ সভায় ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক বাঘ সংরক্ষণ সংস্থা অভয়ারণ্য ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্রতিনিধি ডেবি ব্যাংকস, টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রির প্রতিনিধি ও জিটিএফ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাঘের মাথা, চামড়া, হাড় পাচার সর্বোপরি সকল ধরনের টাইগার প্রজেক্ট নিষিদ্ধ করার জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৭ হাজার ৫০০ বাঘ রয়েছে। তার মধ্যে ভারতে ৪ হাজার ৭১৫টি এবং বাংলাদেশে আছে ৩৬২টি। জিটিএফ (Global Tiger Forum)–এর সদস্য দেশ বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান এবং অ–সদস্য দেশ নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, রাশিয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ৪০ জন প্রতিনিধি এ সভায় যোগ দেন। উক্ত দশ দফা ঘোষণা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১) বাঘের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করলে প্রত্যেক টাইগার রেঞ্জ দেশকে আগামী ২০০১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এ তথ্য জিটি এফ সচিবালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে।

২) প্রত্যেক টাইগার রেঞ্জ দেশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ২০০১ সালের জানুয়ারির মধ্যে জিটি এফ সচিবালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে।

৩) প্রতি ৬ মাস পর পর RZO সচিবালয় থেকে তথ্যভিত্তিক নিউজলেটার প্রকাশ করা হবে।

৪) সব দেশকে বাঘ সামগ্রীর ব্যবসা বিলোপের অনুরোধ জানানো হবে।

৫) প্রাথমিকভাবে রয়েল চিতওয়াল/ভাশ্মিক/পারসা এবং বারদিয়া/মোহেলোওয়া, সুন্দরবন, চয়ন পর্বত এবং মেইউ রেঞ্জ, রয়েল মনোস এবং ফিপসু এলাকাসমূহে বাঘ রক্ষার জন্য RZO জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬) RZO বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা ও গবেষণাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

৭) আন্তর্জাতিক বলয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আসন্ন সাইজি, সিবিডি এবং জিটিএফ এর সভায় সদস্য দেশগুলোর মতামত তুলে ধরবে।

৮) RZO দাতাদেশগোষ্ঠিকে নিম্নরূপ ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানানো হবে— (ক) রেঞ্জ দেশসমূহে সংরক্ষণ কার্যক্রম ও (খ) RZO-এর অপারেশনাল কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

৯) RZO সচিবালয়ে বৈজ্ঞানিক ও কৌশলগত সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা হবে।

১০) ফোরামের সদস্য দেশসমূহ এবং টাইগার রেঞ্জ দেশসমূহ জিটিএফ সচিবালয়ের কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে এবং উন্নত দেশসমূহকে ফোরামে যোগদানের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে।

বিজ্ঞানী জিমারম্যান 'Avowed purpose of benefiting posterity' প্রদত্ত বিষয় সংজ্ঞার রেশ ধরে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য অরণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় রাখা দরকার। আর সেই সাথে দরকার পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখা। মানুষের যে দূরদর্শী কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে অরণ্যকে সুরক্ষিত রাখা যায়, বনভূমি সৃজন করা যায়, পরিবেশকে সুস্থিত করা যায়, বন্যজীবজন্তুর আবাস নিরাপদ রাখা যায়, সেই জনমুখী কাজকে অরণ্য সংরক্ষণ বা বনসম্পদ সংরক্ষণ বলে।

৯.৪. জলাভূমি

ইরানে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত রামসার সম্মেলনে জলাভূমির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সে অনুসারে জলাভূমি হল—ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্বাভাবিক বা মানুষের তৈরি অগভীর পানির ডোবা এলাকা যেমন, ছোট বড় নানা মাপের পুকুর, ডোবা, বিল, হ্রদ এবং অন্যান্য জলাশয়। জলাভূমি ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। যেমন, নদী অববাহিকায়, সমুদ্রের উপকূলে, পাহাড়ের ঢালে, মরুভূমির মধ্যে ইত্যাদি। জলাভূমির পানি লবণাক্ত বা মিষ্টি যে কোনো স্বাদের হতে পারে। এ ছাড়া জলাভূমি বিল বা হ্রদের মতো আবদ্ধ অথবা একদিক বা কয়েকটি দিক খোলাও হতে পারে। Ramsar Convention, ১৯৭১

৯.৪.১. জলাভূমির বৈশিষ্ট্য : জলাভূমির বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

১) জলাভূমি অগভীর এবং পানি ঢাকা হবে। তবে সাধারণত বর্ষাকালে এখানে পানির পরিমাণ বাড়ে। ফলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে জলাভূমি অঞ্চলের গভীরতা ও স্থায়িত্বের তারতম্য হতে পারে।

২) জলাভূমি খোলা বা আবদ্ধ হতে পারে। সুতরাং এখানে পানি স্থির হয়ে থাকতে পারে বা বহমানও হতে পারে।

৩) জলাভূমি এলাকার মাটি আশপাশের মাটি থেকে আলাদা হয়। কারণ মাটিতে কাদা ও পাঁকের পরিমাণ বেশি।

৪) এখানে জলজ উদ্ভিদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। কম অক্সিজেনে অভ্যস্ত উদ্ভিদও এখানে জন্মায়।

৫) ভূ–পৃষ্ঠের উপর যে কোনো নিচু জায়গা যেখানে পানি জমে থাকতে পারে সেখানেই জলাভূমির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তা প্লাবনভূমি বা তৃণভূমি যাই হোক না কেন।

৬) জলাভূমির পানি লবণাক্ত, কষা বা মিষ্টি স্বাদের হতে পারে।

৭) জলাভূমি যে কোনো আয়তনের হতে পারে। অর্থাৎ কয়েক বর্গমিটার থেকে কয়েক'শ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত।

৮) মাটির নিচের পানিস্তর সাধারণত জলাভূমির খুব কাছাকাছি থাকে ফলে অনেকক্ষেত্রেই মাটির নিচে জমে থাকা পানি জলাভূমিতে পানির যোগান দেয়।

৯.৪.২. পরিবেশ রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব : পরিবেশকে তার নিজের মতো করে রক্ষা করতে হলে জলাভূমি রক্ষা করার দিকে এখনই নজর দিতে হবে, কারণ—

ক. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা : নিম্নলিখিতভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা ও বৃষ্টির পরে রাস্তাঘাটে পানি দাঁড়ানো বন্ধ করার জন্য : বন্যার অতিরিক্ত পানি বা ভারি বর্ষণের পরে দ্রুত পানি নিকাশের জন্য জলাভূমিগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। কারণ এখনেই বন্যা ও বৃষ্টির পানি শেষ পর্যন্ত জমা হওয়ার সুযোগ পায়। ইদানিং বন্যার প্রকোপ ক্রমাগত বেড়ে চলা বা রাস্তাঘাটে বৃষ্টির পরে অনেকক্ষণ পানি জমে থাকার অন্যতম কারণ হলো যে পুকুর, বিল, ডোবাগুলো হয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মজে গেছে, নয়তো সেগুলো ভরাট করে ফেলা হচ্ছে।

২) ভূ–গর্ভস্থ পানির পরিমাণ বজায় রাখার জন্য : জলাভূমির পানি চুঁইয়ে মাটির নিচে ধীরে ধীরে যত নামতে থাকে, ভূ–গর্ভে পানির সঞ্চয়ও তত বাড়ে। ভূ–গর্ভে পানির এই সঞ্চয় যাতে রক্ষা যায়, তারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। নচেৎ চাষের জন্য সেচের পানি, শহর এলাকায় গভীর নলকূপ থেকে পানীয় পানি পাওয়ার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমবেই।

৩) পানির গুণগত মান বজায় রাখার জন্য : জলাভূমিতে যেসব জলজ উদ্ভিদ ও শৈবাল জন্মায়, তাদের মধ্যে অনেকেই পানিতে দ্রবীভূত হওয়া রাসায়নিক পদার্থগুলোকে শোধন করতে পারে। ফলে প্রায় বিনা খরচে জলাভূমির কল্যাণে পানির গুণগত মান বজায় থাকে।

৪) জৈব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার জন্য : জলাভূমির মধ্যে বেঁচে থাকা জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ছাড়াও অতিথি পাখিরা বিশেষ করে শীতকালে আমাদের দেশে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে। তার ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এইভাবে তাদের জীবনচক্র নিজের ছন্দে চলে। সুতরাং জলাভূমি নষ্ট করলে ছোট শৈবাল থেকে শুরু করে বড় বড় পাখি, মাছ ও অন্যান্য সরীসৃপের প্রাণ বিপন্ন হবে এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হবে।

৫) সামুদ্রিক ঝড়, তুফান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ও উপকূলের ক্ষয় রোধ করার জন্য : উপকূল সংলগ্ন এলাকায় বড় বড় জলাভূমির বিস্তার এই ঝড়–তুফানের সরাসরি জনবসতির উপর আছড়ে পড়তে পারে না। জলাভূমির বিস্তার এই ঝড়–তুফানের তীব্রতা কমিয়ে দেয়। ফলে একদিকে যেমন বড় বড় ঢেউ জলাভূমির মধ্যেই ভেঙে যায়, তেমনি অন্যদিকে উপকূলের জমিও ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এছাড়া— পানীয় পানি যোগান দেওয়া, কলকারখানায় পানির যোগান, বর্জ্যপদার্থ প্রাকৃতিক উপায়ে বিয়োজিত করা, জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা, জলাভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক কারণে জলাভূমি পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা : মাছ চাষের মাধ্যমে পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকেও জলাভূমির তাৎপর্য অপরিসীম। যেমন—

১) মাছ চাষের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগ তৈরি করার জন্য ও বাজারে মাছের চাহিদা মেটানোর জন্য জলাভূমির গুরুত্ব আছে।

২) পদ্ম, শালুক, পানিফল প্রভৃতি কার্যকরি ফসলকে লাভজনকভাবে চাষ করার জন্য জলাভূমি রক্ষা করা জরুরি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জলাভূমি হলো প্রকৃতির কিডনি। সুতরাং শরীরের বর্জ্যপদার্থ পরিষ্কার করার জন্য যেমন কিডনির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি প্রকৃতির বর্জ্য শোধনের জন্যও জলাভূমির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

৯.৫. অনুর্বর ভূমি

যে জমি চাষের অনুপযুক্ত তাকে অনুর্বর ভূমি বলে। মরুভূমির ঊষর জমি, বরফে ঢাকা তুষারাবৃত অঞ্চল, এমনকি অতিরিক্ত ভূমিক্ষয়ের জন্য যে জমিতে চাষ–আবাদ করা যায় না, সেসব পতিত জমিকে অনুর্বর ভূমি (waste land) বলা হয়।

জমি অনুর্বর হলে পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ পরিবেশের উপর অনুর্বর জমির নেতিবাচক প্রভাব আছে। অনুর্বর ভূমির ক্ষতিকর দিকগুলো নিম্নরূপ—

১) জমি ধীরে ধীরে উদ্ভিদ ও নানা ধরনের পশুপাখির বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কারণ গাছপালা সেই জমি থেকে খাদ্যের যোগান পায় না। জীবজন্তুর খাবারও সেই জমি থেকে পাওয়া যায় না ফলে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়।
২) মরুভূমির আশপাশে জমি অনুর্বর হলে মরুভূমির এলাকা বাড়তে থাকে— একে মরুভূমির সম্প্রসারণ বা মরুকরণ বলে।
৩) অনুর্বর পতিত জমিতে যেহেতু গাছপালা জন্মায় না, সেজন্য জলবায়ুও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।
৪) অনুর্বর জমি যেহেতু চাষ-আবাদের অনুপযুক্ত হয়, সেজন্য কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। চাষীর জীবিকার সুযোগ নষ্ট হয়। এতে আয় এবং উৎপাদন দুই-ই কমে।

জাতিসংঘের পরিবেশ সম্পর্কিত একটি কমিশনের ১৯৮৭ সালের রিপোর্টে বলা হয় এখন উন্নয়ন শুধু আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বার্থে। একেই বলা হয় টেকশই উন্নয়ন বা সহনশীল উন্নয়ন।

৯.৬. স্থিতিশীল উন্নয়নে পরিবেশগত গুরুত্ব

পরিবেশবিদ, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিকবিদদের মতে স্থিতিশীলরা সহনশীল উন্নয়ন ব্যবস্থা হলো আধুনিক মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার চাবিকাঠি।

ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ১৯৮৭ সালে তাঁদের 'আওয়ার কমন ফিউচার' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেগুলো হলো—

১) পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ন রাখা
২) পরিবেশের গুণগতমানকে সুরক্ষিত রেখে মানুষের জীবনযাত্রার স্থায়ী উন্নয়ন করা।
৩) ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা : মরুকরণ ও খরার প্রতিরোধ
৪) পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ
৫) গ্রামীন উন্নয়ন ও স্থিতিশীল প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করা
৬) সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা
৭) জলসম্পদ উন্নয়ন
৮) মানুষের ভোগের পরিবর্তন
৯) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন সাধন
১০) পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে এমন বিষাক্ত বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূরীকরণ
১১) বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যের আন্তর্জাতিক পাচার বন্ধ করা
১২) দূষিত পানি ও কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা।

৯.৬.১. এজেন্ডা–২১ : রিও–ডি–জেনিরো শহরে ১৯৯২ সালের ৩ থেকে ১৪ই জুন অনুষ্ঠিত এবং বসুন্ধরা সম্মেলনে গৃহীত ২১ দফা কর্মসূচিকে এজেন্ডা–২১ বলে।

৯.৬.২. স্থিতিশীল উন্নয়ন : এই কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ—

১) বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা

২) অরণ্য ধ্বংস স্থগিতকরণ

৩) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

৪) স্বাস্থ্য সুরক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ

৫) জনবসতি উন্নয়নের স্থিতিশীল বা স্থায়ী বন্দোবস্ত

৬) দারিদ্র্য দূরীকরণ

৭) উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা

৮) জনসংখ্যা সম্পর্কিত স্থায়ী উন্নয়ন

৯) ভূমি সম্পদের সার্বিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

১০) পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার।

দশম অধ্যায়

পরিবেশবাদী আন্দোলন ও আইন

Environmental movement and Laws

পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক দেশের জন্য প্রচলিত আইন রয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক কনভেনশনের মাধ্যমে নতুন নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে। প্রত্যেক দেশের জীব ও সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ, বন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, বন সংরক্ষণ বিভাগ রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে জনজাগরণ সারাবিশ্বে বেশ আলোড়ন তুলেছে ; যেমন— বিশ্বব্যাপী গ্রিন পিস মুভমেন্ট। বাংলাদেশ পরিবেশবাদী আন্দোলনের উদ্যোগে 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলন, ভারতের 'নর্দমা বাঁচাও' আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

১০.১. গ্রিন পিস আন্দোলন

নেদারল্যান্ডের আমস্টারমে ১৯৭১ সালে পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থাটি গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনাল যা সংক্ষেপে গ্রিন পিস নামে খ্যাত। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি গ্রিন পিস-কে তাদের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পরিবেশ আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছে।

গ্রিন-পিস এর লক্ষ্য হলো— (১) জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা ; (২) পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা ; (৩) পরিবেশের ক্ষতিরোধ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা ; (৪) পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় দেড়'শটি দেশে এই সংগঠন রয়েছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ সমর্থক গ্রিন-পিস এর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পরিবেশ আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

১০.২. স্টকহোম সম্মেলন

১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ই জুন সুইডেনের স্টকহোম শহরে জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ১১৩টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। পরিবেশ সমস্যা নিয়ে স্টকহোম সম্মেলনের মতো এত বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইতোপূর্বে হয়নি। স্টকহোম সম্মেলনের মূল প্রস্তাব ছিল যে, মানুষের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সুসংহত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই সম্মেলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

১) পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য জাতিসংঘের অধীনে একটি বিভাগ গড়ে তোলা হবে—যা পরে UNEP নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২) আন্তর্জাতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ২৬টি নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং এই নীতি সম্বলিত একটি দলিল প্রকাশিত হয়। এই দলিলটি স্টকহোম ডিক্লারেশন নামে খ্যাত।

৩) পরিবেশ সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেমন—GEMS, (Global Environmental Service)।

৪) পরিবেশ সংক্রান্ত কাজকর্ম আন্তর্জাতিক স্তরে চালু রাখার জন্য একটি অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে।

১০.৩. বসুন্ধরা সম্মেলন

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সালের ২ থেকে ১৪ই জুন ব্রাজিলের রিও–ডি–জেনিরোতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করার জন্য বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth summit) অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ১৩০টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার নিয়ন্ত্রণের জন্য ২১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এটি এজেন্ডা–২১ (Agenda-21) নামে বিখ্যাত। আলোচ্য অধিবেশনে পরিবেশ সংক্রান্ত ২৭টি নীতি নির্ধারণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এই সম্মেলনে উত্তর ও দক্ষিণের জোটের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত দায়–দায়িত্বের প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দেয়। এটি উত্তর–দক্ষিণ বিতর্ক (North-South Debate) নামে পরিচিত।

১০.৪. নর্মদা প্রকল্প

ভারতের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে খরাপ্রবণ অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়ণ করা। নর্মদা প্রকল্পের এই ইতিবাচক দিকগুলোর সুফল পরিবেশবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, নর্মদা প্রকল্প রূপায়িত হলে ৯২টি গ্রাম সম্পূর্ণ ও ২৯৪টি গ্রাম আংশিক জলমগ্ন হবে। প্রায় ৩ লক্ষের মতো মানুষ কর্মহারা ও বাস্তুচ্যুত হবে এবং প্রায় ৫৪ হাজার হেক্টর জমির উপর বনভূমির আচ্ছাদন বিনষ্ট হবে। ফলে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে যে প্রকল্প রূপায়নের কথা সংশ্লিষ্ট দুটি রাজ্য সরকার বলছেন তার পরিবেশগত কুফল সুফলের চেয়ে বেশি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

১০.৫. পরিবেশ আইন

পরিবেশ আইন হচ্ছে পরিবেশের গুণমান নির্ধারণের সর্বোচ্চ সীমা ও আইন অমান্যকারীর শাস্তিবিধান (Environmental legislation, safe limits, redressing violation of pollution limits)।

পরিবেশ মানুষকে দিয়েছে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ শুধু নিজের লাভের জন্য পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার পরিবেশ আইন প্রণয়ন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানবিক পরিবেশের উপর জাতিসংঘের অধিবেশন হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষ, পরিবেশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। এই অধিবেশনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপযুক্ত পরিবেশ আইন প্রণয়ন করা শুরু হয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত আইন বলতে সেই বিধিবদ্ধ আচরণ ব্যবস্থাকে বোঝায় যার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশকে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, পরিবেশকে কলুষমুক্ত করা যায় এবং সামগ্রিমভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

পরিবেশ আইনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১) প্রতিটি নাগরিকের সুস্থ ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

২) আঞ্চলিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশের উপাদানসমূহের ভারসাম্য বজায় রাখা।

৩) পানিদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূষণমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা।

৪) বায়ুদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলকে দূষণমুক্ত রাখা।

৫) বিপজ্জনক সামগ্রীর উৎপাদন, ব্যবহার, গুদামজাতকরণ, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা।

৬) জিনঘটিত গবেষণা এবং কারিগরি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রসার রোধ করা।

৭) বায়ুদূষণকে নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণের মধ্য দিয়ে শহর এলাকার পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা।

৮) শব্দ দূষণ নিবারণ করা।

৯) শিল্পস্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি বা এলাকা বিধিবদ্ধ করা যাতে জনবসতি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।

১০) নাগরিক হিসেবে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বিধিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

১০.৫.১. বাংলাদেশে প্রচলিত আইন

১. **প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে আইন :** প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে বর্তমান বাংলাদেশে নিম্নলিখিত আইনসমূহ প্রচলিত।

ক. ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট : ১৮৭৮

খ. ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৮৯০

গ. ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৮৯১

ঘ. ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯০১

ঙ. ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯১১

চ. ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯১৮

ছ. ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯২৭

জ. হান্‌টিং শুটিং ও ফিডিং রুল ফর কনট্রোল অব বেসটেড ফরেস্ট ১৯৫৪

ঝ. বাংলাদেশ ওয়াইল্‌ড লাইফ অর্ডার ১৯৭৩

ঞ. ফরেস্ট অর্ডিনেন্স ১৯৮৯, ১৯৭২ সালের বন আইন এবং ১৯৭৩ সালের বন্যপ্রাণী আইন যুগের ধারায় পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। বন আইনের ৩৩(১) উপ–ধারায় বনে পাথর খোড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো, বৃক্ষের ক্ষতি, বনে অনধিকার প্রবেশ ও গবাদি পশুচারণ জামিনযোগ্য অপরাধ। এ আইনটি সংস্কার করা এখন সময়ের দাবি।

২. **মৎস্য ও সামুদ্রিকসম্পদ রক্ষার্থে আইন :** তৎকালীন সময় থেকে শুরু করে বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব মৎস্য আইন প্রচলিত সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

ক. ইন্ডিয়ান ফিসারিজ অ্যাক্ট ১৮৯৭

খ. ইস্ট বেঙ্গল কনজারভেশন এন্ড প্রটেকশন অব ফিস অ্যাক্ট ১৯৫০

গ. টেরিটোরিয়াল ওয়াটার ও মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট ১৯৭৪

ঘ. প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস রুল ১৯৮৫

ঙ. সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩

মৎস্য আইনে হাইব্রিড প্রজাতির মৎস্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে নতুন উপধারা সংযুক্ত হওয়া জরুরি।

৩. **কীটনাশক আইন :** বাংলাদেশে যেসব আইন প্রচলিত সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

ক. পেস্টিসাইড অর্ডিন্যান্স ১৯৭১

খ. এগ্রিকালচার পেস্টিসাইড অ্যাক্ট ১৯৮০

গ. এগ্রিকালচার পেস্টিসাইড অ্যাক্ট ১৯৮০

ঘ. এগ্রিকালচার পেস্টিসাইড অ্যাক্ট ১৯৮০

৪. **নির্গমন আইন :** এ আইনসমূহের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ক. বেঙ্গল মটর ভেহিকেল অ্যাক্ট ১৯৩৯

খ. মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট ১৯৪০ এবং

গ. মোটর ভেহিকেল রুলস ১৯৮৩

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। ১৯৯৭ সালে ১৯৯৫ সালের আইনের অধীনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ জারি করা হয়। এসব আইনে পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সাধারণ জনগণের এ আইনের ধারা পরিবেশ রক্ষার্থে কোনো মামলা দায়ের করার ক্ষমতা নেই। পরিবেশ অধিদপ্তরে কোনো লিগ্যাল জেল না থাকায় এ ব্যাপারে তারাও ব্যর্থ। কাজেই পরিবেশের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে অবহেলা না করে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগকে আরও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

১০.৬ পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা

আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় স্তরে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে কোনো কোনো সংস্থা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষার কাজে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে চলেছে। যেমন—

১০.৬.১. আর্ন্তজাতিক স্তরের বিভিন্ন সংস্থা

১) কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এনডেনজারড্ স্পেসিস্ (CITES) : এই সংস্থাটির আন্তর্জাতিক স্তরে বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। পৃথিবীর যে কোনও দেশ উক্ত সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে।

২) আর্থস্ক্যান (Earthscan) : জাতিসংঘের পরিবেশ প্রকল্প বা ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) ১৯৭৬ সালে এই সংস্থাটি গঠন করে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই বিষয়ে আর্থস্ক্যান সংস্থার উদ্যোগে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশবিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

৩) এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেক্শন এজেন্সি (EPA) : মার্কিন সরকার ১৯৭০ সালে পানি, বায়ু, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, কঠিন বর্জ্য, কীটনাশক ও শব্দদূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষার জন্য এই সংস্থাটি গড়ে তোলেন।

৪) আর্থ ওয়াচ প্রোগ্রাম (Earth Watch Programme) : স্টকহোমে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে মানব পরিবেশ সংক্রান্ত যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে গৃহীত নীতি অনুসারে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এই প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যাপারে আর্থ ওয়াচ প্রোগ্রামের একাধিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

৫) ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (EEC) : ইউরোপের বারোটি দেশ সম্মিলিতভাবে এই গোষ্ঠীটি গড়ে তুলেছে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কৃষি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর আদান-প্রদান, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে EEC কাজ করে।

৬) ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড নেচারাল রিসোর্সেস (IUCN) : এই স্ব-শাসিত সংস্থাটি ১৯৪৮ সালে গড়ে তোলা হয়। এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের মর্গেস শহরে অবস্থিত। এই সংস্থাটি WWF এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে একযোগে কাজ করে।

৭) ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক ইউনিয়ন (ICSU) : আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে এই বেসরকারি সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে এই সংস্থাটির মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত।

৮) ইন্টারন্যাশনাল মেরিন কনসালটেটিভ অর্গানাইজেশন (IMCO) : এই সংস্থাটি দূর সমুদ্রে জাহাজ চলাচল এবং সমুদ্র দূষণ নিবারণের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

৯) হিউম্যান এক্সপোজার অ্যাসেসমেন্ট লোকেশন (HEAL) : আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অধীনে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। বাতাসের গুণাগুণ নির্ধারণ, পানির গুণাগুণ পরীক্ষা এবং খাদ্যের বিষক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর আন্তর্জাতিক সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে।

১০) সাউথ এশিয়া কো-অপারেটিভ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (SACEP) : দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন— বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, পাকিস্তান, ইরান প্রভৃতি পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি গঠন করেছে।

১১) ইউনাইটেড নেশনস্ এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচাবাল অর্গানাইজেশন (UNESCO) : জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোতে শিক্ষা, গবেষণা, তথ্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে UNESCO নামক সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে এই সংস্থাটির মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত। পরিবেশের গুণাগুণ রক্ষা, সামাজিক পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যেও এই সংস্থাটি কাজ করে।

১২) ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) : জাতিসংঘের অধীনে ১৯৭২ সালে এই সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প রূপায়ণের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল ফান্ড নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হয়েছে। কেনিয়ার নাইরোবি শহরে UNEP -এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

১৩) ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (WCED) : জাতিসংঘের ২৩টি দেশকে নিয়ে ১৯৮৪ সালে এই সংস্থাটি গঠন করা হয়। পরিবেশ, মানুষ এবং মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এই সংস্থাটি কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন পরিবেশবিষয়ক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কার্যকারিতা যাচাই করাও এই সংস্থাটির অন্যতম কাজ।

১৪) ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম (MAB) : এই সংস্থাটি ১৯৬৮ সালে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই প্রকল্প ১৯৭১ সালে বাস্তবায়িত হয়। মূলত ১৪টি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি কাজ করে। এদের মধ্যে প্রধান (ক) বনভূমি ও মরু অঞ্চলে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও প্রভাবের উপর সমীক্ষা, (খ) জলাভূমি, হ্রদ, উপকূল ও মোহনা অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও প্রভাবের উপর সমীক্ষা (গ) পার্বত্য এলাকায় মানুষের কাজের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য সমীক্ষা (ঙ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি।

১০.৭. পরিবেশের উপর মানুষের চাপ ও কাজের মূল্যায়ন

বর্তমানে যে কোনো অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করার পূর্বে, সেই উদ্যোগের প্রভাব পরিবেশের উপর কিভাবে পড়তে পারে তার আগাম হিসাব-নিকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এমনকি যে কাজ চালু হয়ে গেছে তারও ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মূল্যায়ন করার রীতিনীতি, কর্ম পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। একে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA) বলে। অধ্যাপক অমিতাভ বসু তাঁর প্রিন্সিপাল্স অ্যান্ড অ্যাপলিকেশন্স অব একাউন্টিং গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (২০০০ সাল) এই সূত্রটি উল্লেখ করেছেন। পরিবেশ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির গ্রহণযোগ্যতা আছে।

কেইনসের মতে, $Y = C + I$

যেখানে, Y = জাতীয় আয়

C = জাতীয় ভোগ

I = জাতীয় বিনিয়োগ

আবার যেখানে, S = জাতীয় সঞ্চয়

এবং C = জাতীয় ভোগ

সুতরাং $Y = C + S$

বা জাতীয় সঞ্চয় = জাতীয় বিনিয়োগ

অতএব, পরিবেশ রক্ষা করে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো একান্ত জরুরি।

১০.৮. নারী ও পরিবেশ

পরিবেশ শুধু প্রাকৃতিক উপাদানের সমষ্টি নয়। পরিবেশের একটি সামাজিক ব্যাপ্তি আছে। নারী ও পুরুষ হলো মানব সমাজের প্রাথমিক উপাদান। নারীর মর্যাদা এবং গুরুত্ব সমাজের সর্বস্তরে সর্বকালে অনুভূত হলেও মাঝে মাঝেই নারী বৈষম্য ও অবিচারের শিকার হয়েছে। পরিবেশগতভাবে নারীর মর্যাদা, সম্মান ও গুরুত্ব রক্ষা একান্ত দরকার। কারণ—

১) শিশুকে গর্ভে ধারণ করা ও জন্ম দেওয়ার শারীরবৃত্তীয় অধিকার মহান সৃষ্টিকর্তা একমাত্র নারীকে প্রদান করেছেন। তাই সুস্থ শিশু যে আগামী দিনের নাগরিক তাকে জন্ম দেওয়া, গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে পুষ্টি যোগান দেওয়া এবং জন্মের পরে তাকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব মায়ের।

২) নারী জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক প্রবণতা বৃদ্ধি করে, জাতীয় চরিত্র গঠনের বীজ বপন করে।

৩) সুস্থ, সরল, সামাজিকভাবে সচেতন মা সর্বদা শিশু মৃত্যুর হার কমায়। শিশুকে অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। সন্তানের মধ্যে ভাল–মন্দের ধারণা গড়ে দেয়। সেই সাথে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে সুনাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটায়।

৪) নারীর মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

৫) স্বোপার্জিতা নারী পরিবারের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির দিকে বিশেষ নজর দিতে সক্ষম হয়। ফলে অপুষ্টির সমস্যা দূর করা সম্ভব।

৬) নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক বিভেদ দূর হলে কর্ম–পরিবেশ আরো সুদক্ষ হতে পারে।

৭) শিক্ষিত এবং সচেতন নারী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মাদকাশক্তি কমাতে পারে। ফলে শুধু যে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যই সুরক্ষিত থাকে তাই নয় সেই সাথে কষ্টার্জিত উপার্জনের সাশ্রয় হয়। সঞ্চয় বাড়ে এবং পরিবারের শান্তি সুনিশ্চিত হয়।

৮) পরিবেশ সচেতন নারী তার গৃহের স্বল্প পরিসরে সবুজের সমারোহ ঘটাতে পারে।

৯) দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে সচেতন নারী।

১০.৯. বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন

সুন্দরবন উত্তরে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, খুলনা জেলার কয়রা ও দাকোপ এবং বাগেরহাট জেলার মংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরনখোলা থানা নিয়ে গঠিত। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৮৫ হেক্টর অথবা ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৫ হাজার ৮ শত বর্গ কিলোমিটার। বন এলাকা ৪ লক্ষ ১ হাজার ৬. শত হেক্টর, নদী ও খাল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৮৫ হেক্টর। সুন্দরবনে প্রায় ৪ শত ছোট বড় নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখী হয়ে প্রবাহিত।

১০.৯.১. মাটির বিশেষত্ব : সুন্দরবনের সালফার ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মাটি উচ্চতর ম্যানগ্রোভ প্রজাতির জন্য সহায়ক। এছাড়া AI_2O_3, CaO, P_2O_5-HI পরিমাণ এ মাটিতে বেশি। মাটি অল্প অম্লীয় হতে অল্প ক্ষারীয় পলিযুক্ত দোআঁশ। pH–এর মাত্রা ৫.৪ মতে ৭.৮ এর মধ্যে।

(ক) **জীবজন্তু :** বর্তমানে সুন্দরবনে ২ প্রজাতির উভচর, ১৪ প্রজাতির পাখি এবং ৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্তপ্রায়। জগদ্বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার *(Panther tigris)* চিত্রল হরিণ *(Axis axis)*, কুমির *(Crocodylus porosus)* সুন্দরবনের ঐতিহ্য।

(খ) **উদ্ভিদ :** বনের শ্রেণিবিন্যাসের দিক থেকে গাছের মজুত ও ঘনত্ব বিশ্লেষণে সুন্দরবনকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যেমন— স্বাদু পানিযুক্ত বনাঞ্চল, মৃদু লবণাক্ত বনাঞ্চল ও তীব্র লবণাক্ত বনাঞ্চল। সুন্দরবনে মোট ৩৩০ প্রজাতির গাছ রয়েছে। এর মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গরান, ধুন্দল, হিজল, হাঁতাল, গাব, গর্জন, পশুর ইত্যাদি।

(গ) **বিশ্ব ঐতিহ্য :** ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৭৯৮তম অধিবেশনে সুন্দরবনকে হ্যারিটেজ সাইট বা বিশ্বসম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। হিরণপয়েন্ট সংলগ্ন নীলকমলে বিশ্ব ঐতিহ্য ফলক উন্মোচন করা হয়েছে।

(ঘ) **পরিবেশগত সমস্যা :** সুন্দরবন এলাকায় চিংড়িপোনা সংগ্রহের ফলে অন্যান্য প্রায় ১০০ অন্য প্রজাতির পোনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। যার ফলে এ এলাকা হয়ে পড়েছে মৎস্যশূন্য। এছাড়া আগামরা রোগের কারণে সুন্দরী গাছ মরে যাচ্ছে। চোরাই পশু শিকারীরা বিষ প্রয়োগে বাঘ ও হরিণ মেরে ফেলছে।

১০.৯.২. প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলনে গৃহীত খুলনা ঘোষণা : বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের আওতায় খুলনার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রূপান্তর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরশের উদ্যোগে এবং আরো প্রায় সত্তরটি পরিবেশ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ২০০১ সালের ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারিতে খুলনায় প্রথম জাতীয় সুন্দরবন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী চারটি সেমিনার এবং একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ, পরিবেশ কর্মী, সরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত খুলনা ঘোষণায় তাদের উদ্বেগ, আশা, আকাঙ্খা ও সুপারিশ ব্যক্ত করেন।

১) সুন্দরবন জীববৈচিত্র্যের এক বিশেষ আধার একথা বিবেচনায় রাখা।

২) সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বনভূমি (পেরাবন) এই তথ্য স্মরণ রাখা।

৩) সুন্দরবনের দক্ষিণাংশকে বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একথা মনে রাখা।

৪) সুন্দরবন থেকে গৃহীত কাঠ, গোলপাতা, মধু, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদ কয়েক লক্ষ লোকের জীবিকার প্রধান উৎস একথা বিবেচনায় রাখা।

৫) সুন্দরবন অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখা।

৬) সুন্দরবনের বিভিন্ন সম্পদ অত্যধিক মাত্রায় আহরণের ফলে সুন্দরবন তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সম্পদ এবং জনবসতিকে রক্ষা করে একথা মনে রাখা।

৭) জাতীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষা করা।

৮) ৫ ও ৭ নং ব্লকের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ফলে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের ক্ষতি হতে পারে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা।

১০.৯.৩. সুন্দরবন সংরক্ষণবিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ

১) সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবিলম্বে উন্নতি ঘটাতে হবে।

২) জাতির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষার জন্য অনতিবিলম্বে বাঘ, হরিণসহ সকল প্রকার প্রাণী হত্যা বন্ধসহ যাবতীয় বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

৩) সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের উন্নয়নকল্পে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং আগ্রহী জনগণের মতামত নিতে হবে যাতে তার কোনো ক্ষতিকর প্রভাব সুন্দরবনের উপর না পড়ে।

৪) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের এ অপূর্ব সমাহারকে সংরক্ষণ, নবায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫) সুন্দরবনের পরিবেশ বিপন্নকারী যে কোনো কার্যকলাপ বিশেষ করে তেল গ্যাস আবিষ্কারের জন্য প্রসন্ধানী উদ্যোগ বন্ধ করতে হবে।

৬) আইনানুগভাবে সম্পদ আহরণকারী জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং যথার্থভাবে সুন্দরবন সংরক্ষণের পক্ষের শক্তি হিসেবে তাদেরকে বিকাশে সংগঠিত করতে হবে।

৭) বিশ্ব–সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে ঘোষিত সুন্দরবনের অংশে সকল প্রকার সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও নবায়নের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮) বন ও বন্যপ্রাণী আইনকে আরও যুগোপযোগী ও প্রয়োগবাদী করে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে সুন্দরবনের জন্য পৃথক আইন করতে হবে।

৯) সুন্দরবনের ভিতর বা পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত নদ–নদীসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। বিশেষ করে গোরাই নদী শাসনের ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

১০) সুন্দরবন এলাকায় চিংড়ির পোনা ধরার জন্য এবং অন্যান্য কারণে মাছসহ বিভিন্ন জলজ সম্পদের যে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তা রোধকল্পে পোনা আহরণকারীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত কর্মপন্থা প্রণয়ন করতে হবে।

১১) সুন্দরবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন স্থান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত এবং পরিবেশসম্মত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

১২) সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এডিবির অর্থায়নে যে বৃহৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে তাতে সুশীল সমাজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আরো ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন চিহ্নিত বিতর্কিত বিষয়ে অধিকতর মতবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান, দক্ষতা ও আগ্রহ বিবেচনা করে সুন্দরবনবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ প্রদান বিবেচনা করতে হবে।

১৪) সুন্দরবনের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে সম্পদ ব্যবহার, নবায়ন ও সংরক্ষণে বিভিন্ন সরকারি কর্মকাণ্ডে জনগণের ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ যা বর্তমানে প্রায় নেই বা অপর্যাপ্ততা ব্যাপকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

১৫) সুন্দরবনের সম্পদ ও সম্ভাবনা এবং সংরক্ষণ, নবায়ন ও উন্নয়নের বিষয়ে গণসচেতনা সৃষ্টির জন্য প্রচার মাধ্যমের অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে।

১৬) সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যে সকল উপাদানসমূহের প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি, রোগ–বালাইসহ যে কোনো কারণের কোন একটি উপাদানের আধিক্য বা লোপসহ সকল প্রকার পরিবর্তন সঠিকভাবে সনাক্তকরণ ও তার প্রতিকার গ্রহণের লক্ষ্যে ক্রমাগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

১৭) সুন্দরবনের অবক্ষয় রোধকল্পে বনবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, পরিবেশবিদ, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন সুন্দরবন ওয়াচ গ্রুপ বা সুন্দরবন পর্যবেক্ষক দল অনতিবিলম্বে গঠন করতে হবে।

১০.১০. গ্রিন হাউস প্রভাব

গ্রিন হাউস প্রভাব হলো পরিবেশকে দূষিত করার অন্যতম পদ্ধতি। বায়ুমণ্ডলে মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনাকে গ্রিন হাউস প্রভাব বলে।

ইংরেজি green house শব্দটির অর্থ হলো গাছপালার পরিচর্যার জন্য কাঁচের ঘর। এই কাঁচের ঘরের মধ্য দিয়ে রোদ যেমন অবাধে প্রবেশ করে এবং সেই ঘরের তাপমান বাড়ায়, তেমনই পৃথিবীকে বিশাল কাঁচের ঘরের মতো ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। সৌরশক্তি এই বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় এবং পুনরায় অবলোহিত শক্তি রূপে (infrared energy) মহাশূন্যে ফিরে যাওয়ার সময় কিছু তাপশক্তি বায়ুমণ্ডলে আবদ্ধ হয়। ফলে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়ে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, জলীয় বাষ্প, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসগুলোর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাদের তাপ ধরে রাখার প্রবণতা বাড়ে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ে।

সুইডিস বিজ্ঞানী সভান্তে আরহেনিয়াস ১৮৯৬ সালে সর্বপ্রথম বাতাসে ক্রমবর্ধমান কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্ষতিকর পরিমাণ সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব শতকরা ০.০৩৫ ভাগ বা ৩৫০ পিপিএম। বর্তমানে প্রতি বছর বাতাসে গড়ে ১.৫ পিপিএম হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যেমন— ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৫° সেলসিয়াস এবং ১৯০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ১° সেলসিয়াস এভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বৃদ্ধি দাঁড়াবে ৩.৫° সেলসিয়াস।

সারণি ১০.১ : পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে গ্রিন হাউস গ্যাস ভূমিকা (%)

গ্রিন হাউস গ্যাস	পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা (%)
১. কার্বন ডাই-অক্সাইড	৪৯%
২. মিথেন	১৮%
৩. নাইট্রোজেন অক্সাইড	৬%
৪. ক্লোরোফ্লোরোকার্বন	১৪%
৫. জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য	১৩%

ওজোন (O_3) তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত গ্যাস। সূর্য থেকে ক্ষতিকর হারে আগত অতিবেগুনি রশ্মি থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে এই গ্যাস পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আবহাওয়ায় প্রতিরোধ ঢাল তৈরি করে রেখেছে। বর্তমানে সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মির দশ থেকে তিরিশ ভাগ ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু ওজোন স্তর যদি শতকরা ১০ ভাগ সংকুচিত হয় তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে অতিবেগুনি রশ্মি পতনের হার শতকরা প্রায় বিশ ভাগ বেড়ে যাবে। ১৯৭৯-১৯৮৬ সালের মধ্যে প্রতিরোধী ওজোন স্তর দারুনভাবে সংকুচিত হয়েছে। উপগ্রহ থেকে পর্যবেক্ষনে জানা গেছে ওজোন স্তর শতকরা ৫ ভাগ সংকুচিত হয়েছে।

ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) এবং হ্যালন নামক কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেই ওজোন স্তর দ্রুত কমে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস তৈরির ধারা—

$$O_2 + hv \rightarrow O + O \text{ — (i)}$$

$$O + O_2 \rightarrow O_3 \text{ — (ii)}$$

$$O_3 + hv \rightarrow O + O_2 \text{ — (iii)}$$

বৈজ্ঞানিকগণ ১৯৭৪ সালে প্রথম আবিষ্কার করেন এ সকল রাসায়নিক পদার্থ ওজোন স্তকে ধ্বংস করছে। ওযুধ স্প্রে করার বোতল, ফাস্ট ফুড প্যাকেট করার জন্য ব্যবহৃত কিছু প্লাস্টিক পদার্থ, ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনারের শীতলকারক এবং দ্রাবক তৈরিকে সিএফসি ব্যবহৃত হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে হ্যালন নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

সিএফসি আবহমণ্ডলে ৫০ থেকে ১২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আবহাওয়ার ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছাতে এর ৫ থেকে ৭ বছর সময় লাগে। স্ট্যাটোস্ফিয়রের ওজোন স্তরের ক্ষয় এক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সিএফসি ধীরে ধীরে স্টাটোস্ফিয়ারের দিকে ধাবিত হয়। সেখানে অতিবেগুনি রশ্মি একে ভেঙে ফ্লোরিন তৈরি করে যেটা পরবর্তীতে ওজোন স্তরকে ভাঙ্গার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

$$O_3 + Cl_2 \rightarrow Cl + 2O_2$$

$$O_3 + Cl_2 \rightarrow Cl + 2O_2$$

এখানে ক্লোরিন পরমাণু ওজোনকে ভেঙে ClO ও O_2 তৈরি করে। পরবর্তীতে ClO আবার ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে দুই অণু অক্সিজেন (O_2) তৈরি এবং ক্লোরিন পরমাণু তৈরি করে। যেটা পরবর্তীকালে যুগপৎভাবে জোনকে বিনষ্ট করে। একটি মাত্র ক্লোরিন পরমাণু হাজার হাজার ওজোন অণুকে এভাবেই ধ্বংস করে। স্বাভাবিকভাবেই এই ক্লোরিন অণু বিক্রিয়া শেষে ট্রপোস্ফিয়ারে ফিরে আসে এবং বৃষ্টির পানির সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে (HCI) পরিণত হয়।

১০.১০.১. প্রতিক্রিয়া : সিএফসি শুধু ওজোন স্তরকেই সংকুচিত করে না তা পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে। ব্যাপক ভিত্তিতে বন ধ্বংস করা, জ্বালানি তেল ও গ্যাসের প্রচুর ব্যবহার ইত্যাদির ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্ট ঘটে। এবং তা সিএফসি-এর ন্যায় এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ ঘটায়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে অতিবেগুনি-রশ্মি নামক এক ধরনের ক্ষতিকর রশ্মি বিকিরণের পরিমাণ বাড়বে। সাধারণ হারের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ অধিক

অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এলে পানির দশ মিটার গভীরে অবস্থিত এক ধরনের মাছের ডিম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণের হার আরো বেড়ে গেলে চর্ম ক্যান্সারের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এর বিরূপ ক্রিয়ায় চোখও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ এজেন্সির অনুমান, ওজোন স্তর সংকোচনের এই হার অব্যাহত থাকলে ২০৭৫ সালের ভেতর অতিরিক্ত ১০ কোটি লোক চর্ম ক্যান্সারে ও ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক চোখের ছানিতে আক্রান্ত হবে। জানা গেছে, ১% ওজোন ক্ষয়ে প্রতি বছর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে ৭০ হাজার। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হবে এবং হেপাটাইটিসের মতো জটিল রোগের প্রকোপ বাড়বে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের যেসব এলাকায় জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কম, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক উপ-সহকারী প্রশাসক অ্যালান হেস্ট জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকার প্যানেলের দুই নম্বর ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদন প্রকাশ কালে বলেন— বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস অব্যাহতভাবে পুঞ্জীভূত হতে থাকলে আগামী দশ বছরে বিশ্বের জলবায়ুর যে পরিবর্তন হবে তা কোনোমতেই বদলানো যাবে না। এরপরেও পৃথিবীতে তাপকে আটককারী গ্যাসগুলো যদি বাড়তে থাকে এবং সমুদ্র এক মিটার স্ফীত হয়, তাহলে বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হবে। রিপোর্টে বলা হয় ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্র যদি এক মিটার স্ফীত হয় কিছু দ্বীপদেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। শহরাঞ্চলের নিম্ন এলাকা হুমকির সম্মুখীন হবে। উর্বর জমি পানিতে তলিয়ে যাবে, বিশুদ্ধ পানি দূষিত হবে এবং উপকূল রেখার পরিবর্তন ঘটবে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, যেসব দেশ ও অঞ্চল শুষ্ক আবহাওয়ায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেগুলো হচ্ছে ব্রাজিল, পেরু, আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় অঞ্চল। উত্তর গোলার্ধের উঁচু অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে কারণ তাপ বৃদ্ধি হতে এলাকায় দীর্ঘ ফসল ফলানোর মৌসুম সৃষ্টি করবে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে দ্রুত খাপ খাওয়াতে না পেরে কিছু বন, গাছপালা, জীবজন্তু দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সাগরতীরবর্তী এলাকা নিয়মিত বন্যায় আক্রান্ত হবে। যেসব এলাকা আজ উর্বর ফসলী জমি, সেগুলো মরুভূমিতে পরিণত হবে আর বরফে ঢাকা বিশাল এলাকা সহসাই কৃষি অনুপযোগী ভূমিতে পরিণত হবে।

বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত পশুরা সম্ভবত চর্ম ক্যান্সার ও চোখের সমস্যায় ভুগবে। অতি বেগুনি রশ্মি যেহেতু পরিষ্কার পানি ভেদ করতে পারে বিধায় তা ছোট মাছ, শূককীট, ফাইটোপ্লাংক্‌টন (অত্যন্ত উপযোগী উদ্ভিদ যার উপর সকল জলজ প্রাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল) ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এমতাবস্থায় মাছের উৎপাদন ও বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ হ্রাস পাবে।

১০.১০.২. উপকূল রেখার পরিবর্তন : সমুদ্রের পানির তাপ বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ তুষার স্তূপ, গ্রিনল্যান্ড ও এন্টার্ক্টিকার অধিকাংশ বরফের স্তূপ গলে যাবে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অধিকাংশ দ্বীপরাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে।

সারণি ১০.২ : ভবিষ্যৎ উপকূল রেখার পরিবর্তনের চিত্র [হকম্যান ১৯৬৩]

পরিবর্তন	বছর				
	২০০০	২০২৫	২০৫০	২০৭৫	২১০০
সিনারিও (Scenario)	১৭.১	৪৫.৯	১১৬.৭	২১১.৫	৩৪৫.০
উচ্চ (High)	৩১.২	৪৯.৩	৭৮.৯	১৩৬.৮	২১৬.৬
(Mid-Range low)	৮.৮	২৬.২	৫২.৬	৯১.২	১৪৪.৪
মধ্যম মাত্রার নিম্ন (Mid-Range low)	৪.৮	১৩.০	২৩.৮	৩৮.০	৫৬.২
নিম্ন (Low)	২.০	৪.৫	৭.০–	৯.৫–	১২.০–
বর্তমান ধারা (Current trends)	৩.০	৬.৮	১০.৫	১৪.৫	১৮.০

১০.১০.৩. প্রতিক্রিয়া-বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত : বাংলাদেশে প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এমন কোনো বছর নেই যা কোনো না কোনোভাবে দূর্যোগ কবলিত না হয়। প্রতি বছর প্রকৃতির রুদ্ররোষে কেড়ে নেয় অসংখ্য মানুষের প্রাণ। গ্রিন হাউস প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র তটরেখা অঞ্চলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে তার কিছুটা পূর্বাভাস উল্লেখ করা হলো।

ক) তটীয় ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের জলমগ্নতা : বাংলাদেশ একটি নিম্ন সমতলভূমি অঞ্চল। সমুদ্রের পানি ১ মিটার স্ফীতিতে এক-ষষ্টাংশ অঞ্চল জলমগ্ন হবে। শুধু তাই নয় বঙ্গোপসাগরে ছোট ছোট দ্বীপগুলো অগভীর সমুদ্রে পরিণত হবে। ৩ মিটার স্ফীতিতে এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

খ) তটরেখার ক্ষয় : সমুদ্রের পানির স্ফীতিতে তটীয় অঞ্চল ক্ষয়ের সম্মুখীন হবে। কক্সবাজার ও মহেশখালীর সৈকত এলাকায় এ ধরনের ক্ষয়কার্য প্রত্যক্ষ করা যায়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে কক্সবাজারের মতো মনোরম দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত সমুদ্রে গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

গ) সমভূমি অঞ্চলের লবণাক্ততা : সমুদ্রের লবণাক্ততা পানির সমুদ্র দূরবর্তী সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর মানতার ফলে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে মিঠা পানির অভাবে কৃষিকাজ, খাবার পানির মারাত্মক সংকট দেখা দেবে। ইতিমধ্যে সুন্দরবনের প্রায় ১৭ ভাগ সুন্দরী গাছ মারা গেছে এবং নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মিষ্টি পানির অভাবে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল হুমকির সম্মুখীন।

ঘ) জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপতা বৃদ্ধি : বাংলাদেশে প্রতি বছর মৌসুমী বায়ু প্রভাবে সাইক্লোন হয়ে থাকে। অনেক সময় সাইক্লোনের সাথে জলোচ্ছ্বাসের মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতির মাত্রা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ বড় নদীগুলো জলোচ্ছ্বাসের আওতায় পড়বে।

৬) বন্যার প্রকোপতা বৃদ্ধি : সমুদ্রের পানি ২ মিটার বৃদ্ধিজনিত কারণে সমুদ্রে পতিত নদীগুলোর গতিমুখ উল্টাদিকে প্রবাহিত হবে। ফলে নদীর বুকে তলানি জমার হার বেড়ে যাবে। কারণ এদেশের বড় বড় নদীগুলো প্রতি বছর ২.৪ বিলিয়ন টন/তলানি সমুদ্রে বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে নদীর বুক ভরাট হয়ে বর্ষা মৌসুমে বন্যার প্রকোপতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়াও বঙ্গোপসাগরের ফানেল আকৃতি, অগভীর মহীসোপান, দূর সমুদ্রে নিম্নচাপের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়।

সারণি ১০.৩ : বাংলাদেশে গত ২১৫ বছরের ঝড়–জলোচ্ছ্বাসের খতিয়ান (BBS, ২০০০)

ক্রমিক	তারিখ	ঘটনা	মৃত্যু
১.	জুন, ১৭৭৫	ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের ৫টি পাকাবাড়ি ছাড়া সব বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়	৪০,০০০
২.	১৭৯৭	ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামের সমস্ত কুঁড়ে ঘর বিধ্বস্ত হয়	--
৩.	অক্টোবর, ১৮৩১	প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে বরিশালের উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয়	--
৪.	অক্টোবর ৩১, ১৮৭২	কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে	--
৫.	অক্টোবর ৩১, ১৮৭৬	হাতিয়া ও নোয়াখালী অঞ্চলে ১০–৪৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়	২,২০,০০০
৬.	মে, ১৮৮২	ঘূর্ণিঝড় বরিশালে আঘাত হানে	--
৭.	অক্টোবর, ১৮৯৭	কুতুবদিয়া ও সংলগ্ন এলাকায় হ্যারিকেন ছোবল হানে	১৪,০০০
৮.	মার্চ, ১৯০৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হয়	--
৯.	সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৯১	বরিশালে জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড় হয়	৩৮,৯৫০
১০.	মে, ১৯২৬	কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	--
১১.	মে, ১৯৪১	মেঘনা অববাহিকায় ঘূর্ণিঝড় ও ১০ ফুট জলোচ্ছ্বাস হয়	--
১২.	অক্টোবর ১০, ১৯৬০	নোয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড় ও ১০ ফুট জলোচ্ছ্বাস হয়	৩,০০০
১৩.	অক্টোবর ৩১, ১৯৬০	চট্টগ্রামে ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় ও ১০ ফুট জলোচ্ছ্বাস হয়	৫,১৪৯
১৪.	মে ৩১, ১৯৬৩	মেঘনা অববাহিকায় পশ্চিমাংশে ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় ও ৬–১৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়	১২,০০০

১৫.	মে ৩১, ১৯৬৩	ঘণ্টায় ১০০–১৫০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় ও ১০–১৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়	১১,০০০
১৬.	মে, ১৯৬৫	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ১০০–১২০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় হয়	১৯,০০০
১৭.	ডিসেম্বর, ১৯৬৬	কক্সবাজার অঞ্চলে ঘণ্টায় ১৩৯ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় হয়	১,০০০
১৮.	অক্টোবর ১, ১৯৬৬	চট্টগ্রাম ও সংলগ্ন দ্বীপে ঘণ্টায় ৮০–১০০ মাইল বেগে ঝড় ও ২০–২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়	৮৫০
১৯.	নভেম্বর, ১৯৭০	ঘণ্টায় ১৩৮ মাইল বেগে একটি তীব্র হারিকেন ও ৩৩ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়	৫,০০,০০০
২০.	মে ২৪, ১৯৮৫	চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী দ্বীপগুলোতে ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় ও ১২–২০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়	১১,২৬৯
২১.	নভেম্বর ২৯, ১৯৮৫	সুন্দরবনে ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় এবং ৮–১২ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়	--
২২.	এপ্রিল ২৯, ১৯৯১	ঘণ্টায় ১৪৫ মাইল বেগে হ্যারিকেন এবং ২৬ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস মধ্যরাতে চট্টগ্রাম আঘাত হানে। এ অঞ্চলে সংঘটিত দুর্যোগের মধ্যে এটি সব চাইতে ভয়াবহ।	

১০.১০.৪. প্রতিক্রিয়ার কারণ ও প্রতিকার : অপরিকল্পিতভাবে বন নিধন, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ প্রভৃতি বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। যেখানে বাংলাদেশে শতকরা ২৪ ভাগ বন থাকা আবশ্যক সেক্ষেত্রে বনের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, মধুপুরের বনভূমি মাত্র ৩০ বছর আগেও গভীর অরণ্য ছিল। এখন তার মাত্র শতকরা ৫ ভাগ অবশিষ্ট আছে। এই অপরিকল্পিত বননিধনের ফলে নদীর পাড় ভেঙে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। চট্টগ্রাম শহরে সুরম্য অট্টালিকা বানানোর নাম করে পাহাড় কাটা হচ্ছে। এই পাহাড় কেটে একপার্শ্বে ফসল ফলানো হচ্ছে এবং অন্য পার্শ্বে সুরম্য অট্টালিকা গড়ে তোলা হচ্ছে। যার ফলে পানি চুইয়ে পাহাড়ের নতির (gradient) দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে ভূমিধস, পলি জমে বন্যা এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমি অপরিকল্পিতভাবে ভূমিধ্বসের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৫০ শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাসের সৃষ্টি করে। গাছপালা বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি জটিল অণু। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত অতিলোহিত বিকিরণ এটা শুষে নেয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে। আবহাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো পদার্থ না থাকলে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের গড় তাপমাত্রা শূন্যের নিচে অর্থাৎ ২০০০ সে. এর বেশি হতো না। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কয়লা ও তেলের ব্যবহার বেড়েছে ১২ গুণ। ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে। আর এই অধিক জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে বর্গমাইলব্যাপী বন কেটে পরিষ্কার করা হচ্ছে। অথচ এই গাছপালাই হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের একমাত্র প্রাকৃতিক শোষক।

তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য বনভূমি প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের জন্য সাম্প্রতিককালে একটা ভয়াবহ খবর হলো, মায়ানমার থেকে আগত উদ্বাস্তু রোহিঙ্গারা কক্সবাজার এলাকায় প্রতিদিন ২০ লক্ষ টাকার জ্বালানি কাঠ পোড়াচ্ছে। যার ফলে ১৫০ কোটি টাকার বনভূমি ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে দেশের অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা নিম্নরূপ প্রস্তাব প্রদান করেছেন।

১) বাঁধ নির্মাণ : উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মাটির বাঁধ নির্মাণ করে জলোচ্ছ্বাস ঠেকানো যায়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর বাঁধ তৈরি করতে হবে।

২) বনায়ন : দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় দুই পর্যায়ে বাঁধের দু'পাশে প্রশস্ত বনায়ন করতে হবে।

৩) জোন গঠন : উপকূলবর্তী অঞ্চলকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে কয়েকটি জোনে ভাগ করতে হবে।

৪) বহুতলবিশিষ্ট আশ্রয়স্থল নির্মাণ।

৫) সতর্কীকরণ সংকেতের আধুনিকায়ন।

৬) সমুদ্র ও স্থলভাগের তাপমাত্রা নিরূপণের ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে।

৭) দুর্যোগ প্রতিরোধ অধিদপ্তর গঠন।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা পাশাপাশি অবস্থান করছে। ফলে সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণ সহজসাধ্য নয়, শুধু সরকারি বা বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানই নয়, দুর্যোগ প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যেতে হবে।

১০.১০.৫. প্রতিরোধের উপায় : ওজোন স্তরকে রক্ষা করতে হলে সিএফসি উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘ প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সিএফসি ওজোন স্তরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী। ১৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক সমীক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা (মহাশূন্য সংস্থা) ভবিষ্য তবাণী করেছে যে, বর্তমান হারে গ্রিন হাউজ গ্যাসের বহির্গমন

অব্যাহত থাকলে আগামী ৭০ বছরে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তর শতকরা ৯ ভাগ সংকুচিত হবে।

১৯৮৫ সালে ওজোন স্তরের বিপর্যয় নিয়ে নুতন করে উদ্বেগের সূচনা হয়। মার্কিন উপগ্রহ নিমবাস–৭ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে জানা যায় যে, দক্ষিণ মেরুতে এক বিশাল ওজোন গহ্বর এর সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অ্যান্টার্টিকার উপরিভাগে এ গহ্বর সৃষ্টি হয়। এ সময়ে এ অঞ্চলের স্ট্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তর শতকরা ৪০ ভাগ হালকা হয়ে যায়।

পশ্চিমা দেশসমূহ প্রতিবছর ৭৫০,০০০ টন সিএফসি-11 এবং সিএফসি-12 উৎপাদন করে। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে উৎপাদন করে ৬০,০০০ টন। ওজোন ধ্বংসকারী অন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ বার্ষিক ২,০০০০০ টন। এর মূল্যমান প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার। আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পেয়ে বৃহৎ সিএফসি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এর বিকল্প সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও পরিবেশ সংরক্ষণে CO_2 ও সিএফসি এর বর্ধন তথা গ্রিন হাউস প্রভাব রোধ করার পথে অনেক বাধা। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো তাদের নুতন স্থাপিত শিল্পকারখানায় কয়লা ও তেলের ব্যবহার পরিত্যাগ করতে চাইবে না। বিজ্ঞানীদের মতে শেষ পর্যন্ত মানবজাতিকে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যেমন— যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে সেখানে গমের বদলে ভুট্টার চাষ হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব হবে এবং শেষ আশ্রয় হিসেবে মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করবে।

তাছাড়া সিএফসি নিষ্ক্রমণ রোধে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এর মধ্যে প্রতারণা বা ছলনার সুযোগ থেকে যাবে। একটি সিএফসি অণুর গ্রিন হাউজ প্রভাবের স্থায়িত্বকাল ৭০ থেকে ১০০ বছরেরও অধিক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এরা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পিতার পাপের ফল যেমন সন্তানে বর্তায় তেমনি করে যুগের পর যুগ ধরে অতীত প্রজন্মের অন্যায়ের ফসল এই সিএফসি বহন করে বেড়াবে।

ওজোন স্তরের ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য বিকল্প সিএফসি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলোও স্বল্প উচ্চতায় ওজোন স্তরের ক্ষতি করবে। নয়া উদ্ভাবিত সিএফসি তে 11_2 রয়েছে। এর অর্থ ওজোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ফটোকেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় এই সিএফসি ভেঙে যাবে।

ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাংলিয়াস স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড কেমিক্যাল সায়েন্স–এর মিঃ স্টুয়ার্ট পেনকেট উল্লেখ করেন ওজোন সমস্যার সমাধান কোনোমতেই সম্ভব নয়। সিএফসি নিষিদ্ধকরণ আংশিক সমাধান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন তা হলো নাইট্রোজেন অক্সাইডের নির্গমন সম্পূর্ণ রোধকল্পে অভিযান চালানো।

আবহাওয়ার নিম্নস্তরে ওজোন সঞ্চিত হলে অক্সিজেনের উপর এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া গাছপালার জন্য খুবই ক্ষতিকর। কারণ তা উদ্ভিদ কোষের অত্যন্ত নরম ঝিল্লিকে আক্রমণ করে এবং ওজোনের সঞ্চয় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি হলেই এই অবস্থা ঘটে।

আই.সি.আই (ICI) ডু-পন্ট প্রভৃতি বৃহৎ রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো ওজোন স্তরের প্রতি অতি নমনীয় সিএফসি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছে। এগুলোর সবই হাইড্রোকার্বন এবং আগের সিএফসি গুলোর তুলনায় এর মধ্যে ফ্লোরিন ও ক্লোরিনের পরিমাণ অনেক কম। ফটোকেমিক্যাল প্রতিক্রিয়ার প্রতি অতি নমনীয়। কিন্তু কল-কারখানায় জ্বালানির দহনের ফলে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের দ্বারা নিম্নস্তরের আবহাওয়া দূষিত হয়, সূর্য্যের অতিবেগুনি রশ্মি এক জটিল ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া শুরু করে এবং ফলে ফটোকেমিকেল ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। তবে এই সমস্যা কতটুকু জটিল হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। মিথেনের প্রধান উপাদান হাইড্রোকার্বন প্রতি বছর ৫০০ টন হারে আবহাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। যদি ধরা হয় নতুন উদ্ভাবিত সিএফসি সম্পূর্ণরূপে পুরাতনগুলোর স্থান দখল করে, তাহলে প্রতি বছর মাত্র ৫ লক্ষ টন হাইড্রোকার্বন বায়ুমণ্ডলে মিশে যাবে। এর ফলে সম্ভাব্য ওজোন উৎপাদনকারী রাসায়নিক দ্রব্যের বৃদ্ধি ঘটবে মাত্র ০.১ শতাংশ।

সারণি ১০.৪ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওজোন গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ

দেশ	পরিমাণ (টন)	শতকরা
যুক্তরাষ্ট্র	৪,৪৫,০০০	৩৭.৪%
পশ্চিম ইউরোপ	৪,৪০,০০০	৩৬.২%
জাপান	১,৫০,০০০	১২.৪%
প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ	১,২০,০০০	৯.৯%
অবশিষ্ট বিশ্ব	৫০,০০০	৪.১%

১০.১১. আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়বদ্ধতা ও করণীয়

ওজোন স্তরের বিপর্যয় একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। ১৯৮০ সালে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহ ওজোন স্তর সমন্বয় কমিটি গঠন করে। ১৯৮৫ সালে কমিটির বৈঠক হয় এবং ২৭টি দেশ ওজোন স্তর সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে। ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল বৈঠকে দেশগুলো ১৯৯৯ সালের মধ্যে সিএসফি -এর উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে UNCED ৫ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের প্রধান সাহায্যদাতা বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন, আরো বেশি পয়ঃনিষ্কাশন, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ পানির সংস্থান এবং ধোঁয়া ও ঝুলকালির সৃষ্টি কমানোকে নতুন করে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

রিও-ডি-জেনিরোতে আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯২ শীর্ষক প্রতিবেদনের ব্রিটিশ প্রণেতা এন্ড্রু স্টিয়ার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটির প্রধান বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছেন।

১) পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বিধানের অভাব সম্পন্ন ১৭০ কোটি মানুষ।

২) ধোঁয়া ও ঝুলকালি মিশ্রিত অ-নিরাপদ পরিবেশের হুমকির মুখে ১৬০-২০০ কোটি মানুষ।

৩) নিরাপদ পানিবিহীন ১০০ কোটি মানুষ।

৪) কোটি কোটি মানুষ—যাদের জীবন জীবিকা ভূমি ও বন সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক সমালোচিত হয়েছে। ব্যাংকটি ব্রাজিলের বন ধ্বংস করে বসতি ও রাস্তাঘাট নির্মাণে অর্থ দিয়েছে। হাজার হাজার ভারতীয়কে উচ্ছেদ করে বাঁধ তৈরিতে তহবিল যুগিয়েছে। বিজ্ঞানী স্টিয়ার স্বীকার করেছেন, কখনো কখনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত জাতিংঘের পরিবেশ কর্মসূচি বিষয়ক এক বিশেষ অধিবেশনে ৫৪টি সদস্য দেশ অংশ নেয়। এই অধিবেশনে সদস্যরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এসব দেশের কাছে সহজ শর্তে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে তার জন্য ভারতের গঙ্গার পানির সুষম বন্টন দায়ী। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পানি সমস্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক ড. তোলবা তুক বাংলাদেশের প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং রিও সম্মেলনে আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ৩-১৪ই জুন ১৯৯২ ব্রাজিলের রিওডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশবাদীদের শীর্ষ বৈঠক। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ফের্নান্দো কোলোর দে মেইয়ার মতে, এ হলো ইকোলজির বিশ্বকাপ। পরিবেশের ক্ষতি না করে কি করে ২১ শতকে প্রবৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে তার নকশা তৈরি করতে পৃথিবীর নেতারা বসেন এই ধরিত্রী সম্মেলনে। ৭০০ জাতিসংঘ কর্মকর্তা, ২০০ অধিরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, ১৮৫টি দেশ থেকে প্রায় ৩,৫০০ প্রতিনিধি, ১৫০০ এনজিও থেকে ১২,০০০ প্রতিনিধি আর প্রায় ২৫০০ সাংবাদিক বসেন এই সম্মেলনে। জাতিসংঘের পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা (UNCED) নিউইয়র্ক ছেড়ে রিওসেন্দ্রো কনভেনশন সেন্টারে ১২ দিনের জন্য বৈঠকে বসে। কনভেনশনে কাগজপত্রগুলোর একটি হলো আর্থ চার্টার পরিবেশবাদীদের সনদ। তাতে পরিবেশ সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা উল্লেখ ছিল। অন্য আরেকটির নাম এজেন্ডা-২১। তাতে ছিল ২১ শতকে পরিবেশের ক্ষতি না করে উন্নয়ন ঘটানোর নক্সা। তৃতীয়টি হলো বিশ্ব উষ্ণতা ঠেকানোর চুক্তি।

সারা পৃথিবীতে যতটা CO_2 ছড়ানো হয় তার এক-চতুর্থাংশ ছড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই। এই গ্যাসই বিশ্ব উষ্ণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।

সামিটের প্রধান সমন্বয়ক কানাডার মরিস স্ট্রং বলেন এজেন্ডা-২১ এর মোট খরচ দাঁড়াবে বছরে ১২ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু গত দু'বছরে আলোচনার পর কাউকে টাকা জোগান দানে রাজি করানো যায়নি। অনেক সরকার মনে করেন পরিবেশ রক্ষার তহবিল বিশ্বব্যাংকের কাছেই থাকা উচিত। কিন্তু অনেকের মতে, বিশ্বব্যাংকের হাতে পরিবেশ তহবিল ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। বৈঠকে জাপানী পরিবেশ মন্ত্রী সুজাবুরো নাকসুরা

জাপান তার মিত্রদের সাথে আলোচনা করে চাঁদা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। দাবি–দাওয়া পেশের ক্ষেত্রে কমনওয়েল্থ চেয়ারম্যান রবার্ট মুগাবে ১৯৮৯ সালের ল্যাংগায়ি ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তা বাস্তবায়নের দাবী জানান।

রিও সম্মেলনের সফলতা নিরূপণের সময় এখনও আসেনি। তবে ভবিষ্যতই বলে দেবে এর কার্যকারিতা। রিও সম্মেলনে সফলতা ও ব্যর্থতার খতিয়ান উল্লেখ করা হলো ।

সফলতা	ব্যর্থতা
১. পরিবেশ দূষণে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণে শিল্পোন্নত এবং শিল্পোন্নত ভুক্ত দেশগুলোকে চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে চাপ প্রয়োগ	বন সংরক্ষণ চুক্তিতে : ব্যর্থতার কারণ তৃতীয় বিশ্বের আপত্তি।
২ সামুদ্রিক ফ্লোরা ও ফোনা (Flora and Fauna) চুক্তি (US–এর অস্বীকৃতি)	উত্তর মেরুর অভিযোগ দক্ষিণ মেরুর পরিবেশ সংরক্ষণে আশাতীত ব্যর্থতা
৩. এজেন্ডা–২১ পরিবেশ সংরক্ষণে এবং উন্নয়নে কার্যকরী ও রক্ষণশীল পদক্ষেপ গ্রহণ (বাধ্য–বাধকতাবিহীন)	বৈঠকে অনেক জটিল পরিবেশ সমস্যার ব্যাপারে আলোকপাতে অদূরদর্শিতা
৪. বন সংরক্ষণে নীতিমালা গ্রহণ (বাধ্য বাধকতাবিহীন)	উত্তর মেরুর অর্থনৈতিক সফলতা ও উন্নতি পরিবেশ ধ্বংসে জড়িত (আলোচনা বহির্ভূত)।

১০.১২. পরিবেশ দূষণের অন্যান্য উপাদান

১০.১২.১. যুদ্ধ : বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ দূষণে যুদ্ধ অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। ১৯৯১ সালে সংগঠিত ইরাক–কুয়েত যুদ্ধের সময় সমুদ্রে জ্বালানি তেলের নিঃসরণে প্রচুর পরিমাণ সামুদ্রিক ডলফিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তেলক্ষেত্রগুলোতে অগ্নিসংযোগের ফলে যে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় পরিবেশবাদীদের ধারণা– এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার আঘাত চিহ্ন আজও বয়ে বেড়াচ্ছে সে দেশের জনগণ।

এ ছাড়াও দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। গত দুই দশক ধরে মোজাম্বিকের সরকারি সৈন্য ও বিদ্রোহীদের সাথে (RENAMO) গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। আগে যেখানে বন্য হাতির সংখ্যা ছিল ৫০,০০০–৬০,০০০ বর্তমানে সেখানে মাত্র ১৩,৫০০ বন্য হাতি বেঁচে আছে। জনৈক মার্কিন সাংবাদিক বলেন, মোজাম্বিকের বেইরা (Beira) শহরে জ্বালানির উচ্চমূল্যের জন্য ঘরবাড়ির জানালা, দরজা ব্যবহার করছে। লন্ডনভিত্তিক পরিবেশবাদী সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ–শুধু বিদ্রোহীরাই নয় সরকারি সৈন্যরাও বিমান হামলা দ্বারা হাতি ও গন্ডারের দলকে ধ্বংস করছে। পরিবেশবাদীদের ধারণা যুদ্ধকে যদি এখনই বন্ধ করা না যায় তবে অচিরেই সে দেশের পরিবেশ মরুদ্যানে পরিণত হবে।

এছাড়া অনিয়মিত পারমাণবিক পরীক্ষা ও পরিবেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। আর এসব কারণে এসিড বৃষ্টির বিষময় ক্রিয়ায় বনভূমি নষ্ট হচ্ছে।

১০.১২.২. অপরিকল্পিত বাঁধ : ভারতে অপরিকল্পিতভাবে ফারাক্কা বাঁধের সাহায্যে গঙ্গার পানি একতরফাভাবে ব্যবহারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে প্রচণ্ড পানি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পানি সমস্যা এবং দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে লবণাক্ততা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইতোমধ্যে সুন্দরবনের ১৭ ভাগ সুন্দরী গাছ মারা গেছে এবং মিঠা পানির অভাবে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল হুমকির সম্মুখীন। শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আকস্মিক বন্যা ও নদীর পাড় ভাঙনের ফলে বাঁধ সংলগ্ন একটি জেলা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। শুধু ফারাক্কা বাঁধ নয় বিশ্বে বহু বাঁধ এরকম মরণ ফাঁদের সৃষ্টি করেছে।

১০.১২.৩. কীটনাশক ও সারের অপরিকল্পিত ব্যবহার : ঢাকা শহরের তিনটি মার্কেট থেকে সংগৃহীত শুটকী মাছের লাবরেটরি পরীক্ষা থেকে জানা যায়, এদের দেহে ডিডিটি নামক কীটনাশকের অস্তিত্ব রয়েছে। টাঙ্গাইলের কিছু মাছের দেহেও অনুরূপ কীটনাশকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ কেমিক্যাল সোসাইটি এক সেমিনারে এ তথ্য জানিয়েছে। অপরিকল্পিত সার ও কীর্টনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির গুণাগুণই শুধু নয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ও পরিবেশকে দূষণ করছে।

এছাড়া বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ কৃষকের সার ও কীটনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান নেই। ১৯৭৫-৯০ পর্যন্ত কীটনাশকের ব্যবহার ৩০০০ টন থেকে বেড়ে ৬০০০ টনে পৌঁছেছে।

এক গবেষণায় জানা গেছে, কীটনাশক মাটিতে অবস্থিত জৈব পদার্থগুলোকে বাষ্পে পরিণত করেছে। তাছাড়া কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে খাল-বিলে অবস্থিত মাছের ডিম নষ্ট হওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ মাছের সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো যে মাছ বা শাকসবজি দূষিত হচ্ছে সেগুলো নিরূপণের ব্যবস্থা না থাকায় অল্প করে আমরা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছি। যার ফলে ভোক্তাদের ভবিষ্যতে যকৃত, কিডনি নষ্ট এমনকি ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগ হতে পারে।

১০.১৩. পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয়

১০.১৩.১. পরিবেশ সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা : বাংলাদেশে প্রতি বছর রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজে প্রায় ১০৪ কোটি মনেরও বেশি (৩৮ মিলিয়ন টন) জ্বালানি, যেমন— কাঠ, খড়কুটা, পাতা, ঘুটে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। একটা দেশের সুষ্ঠু প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে হলে শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের রয়েছে শতকরা ৭-৯ ভাগ। তাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত কেটে ফেলা হচ্ছে। ফলে দেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের বনসম্পদ রক্ষা করতে হলে জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে যে চুলা ব্যবহৃত হয় তার তাপশক্তির

শতকরা ৫–১৫ ভাগ কাজে লাগে বাকি ৮৫–৯৫ ভাগ তাপশক্তির অপচয় ঘটে। অন্যদিকে চুলায় সৃষ্ট গরম গ্যাস শতকরা ৮০–৮৫ ভাগ মহিলার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এই চুলা পরিবেশকেও দূষিত করে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ উন্নতমানের চুল্লি উদ্ভাবন করেছে। যাতে শতকরা ৫০–৭০ ভাগ জ্বালানির সাশ্রয় হয়। এ উন্নত চুলা সারাদেশে ব্যবহৃত হলে ১৮.৪ মিলিয়ন টন প্রচলিত জ্বালানির সাশ্রয় হবে এবং দেশের বার্ষিক সাশ্রয় দাঁড়াবে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। এ চুলার মাধ্যমে অবশ্যই মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং গৃহ পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে।

১০.১৩.২. পরিবেশ সংরক্ষণে সকলের করণীয় বিষয় : প্রাণী ও প্রকৃতি এক অভিন্ন সত্তা। প্রাণী তার বেঁচে থাকার জন্য ওতপ্রোতভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রাণীর পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গাছপালা শোষণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। এক গবেষণায় জানা যায়, রাশিয়াতে ১ হেক্টর ঘন বনভূমি ৪ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ২ টন অক্সিজেন ত্যাগ করে। ১ হেক্টর পাইন বন বছরে ৩৬ টন ধূলো নির্গমনে সহায়তা করে।

বনভূমি প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে ভূমিক্ষয় থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করে। বৃষ্টিপাতের পানি প্রবাহ গাছপালার শিকড় পানি চুয়ে ভূ-গর্ভে পানি সংরক্ষণে সহায়তা করে। যেখানে বনভূমি অঞ্চলে ভূমিক্ষয় শতকরা ৫–১০ ভাগ সেখানে সমভূমি অঞ্চলে ভূমিক্ষয় হয় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত বন বা গাছপালার গুরুত্ব বিষয়ক অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা তথা বনায়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

একটা মোটরগাড়ি ১০০০ কিলোমিটার পথ চলতে যে পরিমাণ অক্সিজেন (O_2) পোড়ায় তা একজন সুস্থ মানুষের ১ বছরের অক্সিজেন গ্রহণের সমান। আকাশে একটা উড়োজাহাজ ৮০ টন অক্সিজেন পোড়ায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে আগামী শতকে দেখা যাবে ৯০ শতাংশ অক্সিজেন ব্যবহৃত হবে কলকারখানায় আর বাকি ১০ শতাংশ অবশিষ্ট থাকবে সমগ্র মানব জাতির জন্য।

রাশিয়ার চেরেনোবিল পারমাণবিক দূর্ঘটনা, ভারতের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, সাম্প্রতিক ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ সবকিছুই এই সুন্দর শ্যামল পৃথিবীকে ধ্বংস করার কাজে অগ্রসর হচ্ছে। জার্মানিতে এসিড বৃষ্টির ফলে ৫০ ভাগের বেশি বন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানে মানব জাতি এক চরম উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত। এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও আজ সমগ্র মানবজাতি হুমকির সম্মুখীন। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে হাতে হাত মিলিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। আর এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সুষম বনায়ন, মারণাস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ ইত্যাদি সকলের জন্য আশু করণীয়। মনুষ্যত্বের জয়ে প্রকৃতিরও জয়। বনের প্রকৃতিকে অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হলে সকলকেই শামিল হতে হবে সকলেরই স্বার্থে।

১০.১৩.৩. পরিবেশ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ক. বিশ্বে গড়ে প্রতি মিনিটে :

১) পৃথিবীর বুক থেকে ২১ হেক্টর পরিমাণ বনভূমি উজাড় হচ্ছে।

২) ৩৫,০০০ টন পেট্রোলিয়াম পোড়াচ্ছি।

৩) ১২,০০০ টন কার্বন ডাই–অক্সাইড বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছি।

৪) ৫০,০০০ টন উর্বর পরিমৃত্তিকা বাতাস অথবা জলে মিশে যাচ্ছে।

খ. বিশ্বে প্রতি ঘণ্টায় :

১) ৬৮৫ হেক্টর ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

২) ৫৫ জন মানুষ কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্যাদিজাত বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

৩) পরিবেশ বিনষ্টের কারণে ৬০ জন মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

গ. বিশ্বে প্রতি ৫ ঘণ্টায় :

১) এই গ্রহে একটি প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। এই হারে জৈব পরিবেশের ক্রমাবনতি হতে থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ প্রতি ২০ মিনিটে একটি করে প্রাণী প্রজাতি পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাবে।

ঘ. বিশ্বে প্রতিদিন :

১) ২৫,০০০ মানুষ জলের অভাবে অথবা জলদূষণের কারণে মারা যায়।

২) পৃথিবী জুড়ে চালু ৩৬০টি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে প্রায় ১০ টন পারমাণবিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়।

৩) উত্তর গোলার্ধে এসিড বৃষ্টির কারণে ২,৫০,০০০ টন H_2SO_4 নির্গত হয়।

৪) প্রায় ২,৫০,০০০ মানুষ জন্মগ্রহণ করছে।

৫) প্রায় ১৪০টি প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্তি ঘটছে।

৬) প্রায় ১,৪০,০০০ নতুন যানবাহন বাস, ট্রাক ইত্যাদি পথে নামছে (বর্তমান সংখ্যা আনুমানিক ৫০০ মিলিয়ন)

৭) অশোধিত ১২,০০০ ব্যারেল অশোধিত খনিজ তেল মহাসাগরের পানিতে মিশছে।

১০.১৩.৪. বিশ্বের জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে : বিজ্ঞানীদের মত

একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী দল বলেছেন, বিগত তুষার যুগে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে বিশালাকায় হিমবাহের প্রবাহের ফলে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, পৃথিবীর জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নেচার পত্রিকায় ১৯ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে গবেষকরা বলেছেন, তাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন যে স্তর থেকে চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বেকার সময়ের মধ্যে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপরিভাগের পানি তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমপক্ষে ছয়বার ঠাণ্ডা হয়েছে। ফলে বিশালাকায় হিমবাহ গড়ে না গিয়ে মহাসাগর দিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে।

বিজ্ঞানী বলেন, পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার বছরের মধ্যে এই প্রচণ্ড শীতল জলবায়ু সংক্ষিপ্ততম সময়ের জন্য বিরাজ করে। এ জলবায়ু মাত্র কয়েক'শ বছর এমনকি কয়েক দশকও স্থায়ী হতে পারত। এ দলে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। তারা বলেছেন, শীতল তাপমাত্রার নয়া স্থায়ীত্বকাল চিহ্নিতকরণের পূর্বে হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে বিশ্বব্রহ্মান্ডের তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে শীতল হয়েছিল। এ শীতল অবস্থার ফলে উত্তর আমেরিকান তুষার আচ্ছাদন আরও বিশাল আকার নিয়ে পরিশেষে ভেঙে সমুদ্রে চলে যায়। এই সময়ে মেরু অঞ্চলীয় জলরাশি দক্ষিণ দিকে চলে যায় এবং মহাসাগরের তাপমাত্রা এমন এক স্তরে চলে যায় যার পরিমাণ হচ্ছে বর্তমান তাপমাত্রার চেয়ে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লামন্ট-ডোহারটি জিওলজিক্যাল অবজারভেটরির ঊর্ধ্বতন গবেষণা বিজ্ঞানী জেরারড বন্ড উল্লেখ করেন, হিমবাহগুলোর পর্যায়ক্রমিক গলন প্রক্রিয়া সমুদ্রের লবণাক্ত পানিকে মিষ্টি পানি দিয়ে তরল করে ফেলে। এ প্রক্রিয়া উপসাগর প্রস্রবণ হতে উষ্ণ পানির সরবরাহে বাধা দেয় যার ফলে কানাডা ও ইউরোপের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার তাপমাত্রা আরও নিচে নেমে যায়। তিনি বলেন, হিমবাহ সৃষ্ট এ মিষ্টি পানির ঢাকনা উত্তর আটলান্টিকের ঠাণ্ডা লবণ পানির প্রবাহকে বন্ধ করতে পারে। ফলে উপরিভাগের পানি নিচে চলে যেতে পারে না।

এরকম ঘটনা ঘটলে উপসাগর প্রস্রবণ উষ্ণ পানিকে উপরে আনতে পারে, এর ফলে সবকিছু আরও শীতল হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানী বন্ড আরও বলেন, বিজ্ঞানীরা ঠাণ্ডা লবণ পানির প্রবাহকে ফিরিয়ে দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও অবগত নন। তবে তথ্য পাওয়া গেছে, বর্তমানের উষ্ণ তাপমাত্রায় ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটতে পারে। তার মতে, হিমবাহের এসব ঘটনার পূর্বে পর্যায়ক্রমিক কিছু শীতলকরণ ঘটে গেছে যা সাত হাজার বছর স্থায়ী ছিলো। তারপর দীর্ঘ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পর এখন আবার অত্যন্ত উষ্ণ তাপমাত্রা ফিরে আসছে।

লামন্ট-ডোরটির গবেষক ওয়ালেস ব্রোয়েকার উল্লেখ করেন, "এটা প্রমাণ করছে যে, বিশ্বের জলবায়ু পদ্ধতি এক ধারা থেকে অন্য ধারায় হঠাৎ করে লাফিয়ে চলে যেতে পারে। সেসব হিমবাহের প্রবাহ থেকেই আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বা হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, কানাডা ও গ্রিনল্যান্ডের ওপর ঘুরছে এমন তুষার আবরণ থেকে শিলাখণ্ড পাওয়া গেছে। এসব হিমবাহ মহাসাগরে ভেঙে পড়ার সময় সেসব শিলাখণ্ডকে মহাসমুদ্রে বয়ে নিয়ে যাওয়ার নৌকা হিসেবে কাজ করে।

বিজ্ঞানী বন্ডের মতে, এসব বিশাল হিমবাহের আকার কয়েক বর্গকিলোমিটার ছিলো। যখন এসব হিমবাহ গলে যায় শিলাখণ্ডগুলো মহাসমুদ্রের তলদেশে ডুবে যায়।

১০.১৩.৫. ওজোন স্তর ক্ষয় সম্পর্কে নতুন তথ্য : মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত গবেষণায় একদল মার্কিন পরিবেশ বিজ্ঞানী বলেছেন, এন্টার্কটিকা মহাদেশের উপরস্থ ওজোন স্তরের ক্ষয় সম্পর্কিত কিছু নতুন তথ্য তারা মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পেয়েছেন। তারা বলেছেন, ওজোন স্তরে ফাঁক সৃষ্টি হওয়ার জন্য বর্তমানে যেসব কারণ বিবেচনা করা হয় সেগুলো ছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ইতোপূর্বেই এন্টার্কটিকায় ওজোন স্তরে এ ছিদ্র সম্পর্কে সর্তক করে দিয়েছেন। ওজোন স্তরে ছিদ্র হওয়ায় সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে এসে মানবদেহ এবং পরিবেশের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ওজোন স্তরে এ ছিদ্র বাড়ে বা বড় হয়ে যায় সাধারণত শীতকালে। তারা বলেছেন, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে যখন বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড বেশি থাকে তখন ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা আরও বলেছেন, ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য আগে যেসব কারণকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হতো না। বর্তমানে সে কারণগুলোকেও বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, শীতকালে ক্লোরিন স্টাটোস্ফিয়ারকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করে যা ওজোন-এর ক্ষয়সাধনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। তারা আরও বলেন, তবে আরও কিছু কারণ রয়েছে যা আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সম্ভবত শীতকালের শুরুতে দ্রুত বায়ু প্রবাহের কারণে আরও প্রচুর গবেষণা দরকার।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর উচ্চস্থানে ওজোন স্তর নিচু স্থান অপেক্ষা বেশি থাকবে। তারা বলেন, ওজোন স্তর ক্ষয়ের অন্যতম কারণ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন যা শিল্প কলকারখানা, এরোসল বা রেফ্রিজারেটর থেকে নির্গত হয়ে থাকে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

দেশের সেচ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সরকারি সিদ্ধান্ত কৃষি জমিতে প্রচলিত সেচ ব্যবস্থার মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির পাশাপাশি এসব এলাকায় খাবার পানি সংকট ও সার্বিক পরিবেশের ওপর সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এক্ষেত্রে ইতোপূর্বেকার বিএডিসি নির্ধারিত গাইড-লাইন উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে বিঘ্ন হচ্ছে। যার পরিণতিতে আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে দেশের ব্যাপক এলাকায় সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ

Glossary of Scientific terms

১. Ecology (বাস্তুবিদ্যা) : বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায় তাকে বাস্তুবিদ্যা বলে।

২. Ecosystem (বাস্তুতন্ত্র) : বিভিন্ন অজৈব ও জৈব বস্তুসমূহের কার্যকারিতায় উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীবকুলের পরস্পরের মধ্যে যে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেটাই হলো বাস্তুতন্ত্র।

৩. Terrestrial Ecology (স্থলজ বাস্তুবিদ্যা) : স্থলজ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং তার উপর পরিবেশের প্রভাব।

৪. Fresh water Ecology (মিঠা পানির বাস্তুবিদ্যা) : মিঠা পানির উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পরি'বশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।

৫. Marine Ecology (সামুদ্রিক বাস্তুবিদ্যা) : সামুদ্রিক জীব ও তার উপর পরিবেশের অধ্যয়নের শাখা।

৬. Conservation Ecology (সংরক্ষণ বাস্তুবিদ্যা) : পরিবেশের ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার পথে পরিচালিত ক্রিয়াকৌশল।

৭. Bio-geochemical cycle (জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র) : জীবজগত ও তাদের পরিবেশের মধ্যে পরিচালিত মৌলিক উপাদানগুলোর চক্রাকার আবর্তন।

৮. Food chain (খাদ্য শৃংখল) : খাদ্য ও খাদকের সম্পর্কের বন্ধন।

৯. Trophic level (খাদ্যস্তর) : বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ও খাদকের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্তিকরণ।

১০. Food pyramid (পরিবেশতাত্ত্বিক পিরামিড) : খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন খাদ্য স্তরগুলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যে পিরামিডের আকৃতি সৃষ্টি করে তাই হলো পরিবেশতাত্ত্বিক পিরামিড।

১১. Biomass (জীবভর) : খাদ্যস্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ভরকে জীবভর (Biomass) বলে।

১২. Lentic habitat (আবদ্ধ আবাস) : স্রোতহীন মুক্ত জলাশয় যেমন পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি।

১৩. Lotic habitat (প্রবাহমান আবাস) : স্রোতযুক্ত মুক্ত জলাশয় যেমন— নদী, ঝরনা, সমুদ্র ইত্যাদি।

১৪. Entrophication (অতিপৌষ্টিকতা) : যেসব জলাশয়ের পানিতে পুষ্টির উপাদান অধিক সেখানে ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়া পচনকাজ চালানোর জন্য অধিক হারে অক্সিজেন ব্যবহার করায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে অন্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

১৫. Plankton (প্লাঙ্কটন) : যারা পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

১৬. Nekton (নেকটন) : নেকটন হলো সন্তরণশীল সামুদ্রিক প্রাণী।

১৭. Symbiosis (মিথোজীবিতা) : উদ্ভিদ ও প্রাণী পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনধারণ পদ্ধতি। যেমন— এককোষী শৈবাল হাইড্রার দেহে বাস করে তাদের খাদ্য প্রস্তুতের কাঁচামাল সংগ্রহ করে।

১৮. Climatic factor (জলবায়ুজনিত প্রভাবক) : আলো, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহকে জলবায়ুজনিত প্রভাবক বলে।

১৯. Edaphic factor (মৃত্তিকাজনিত প্রভাবক) : মাটিতে উপস্থিত খনিজ পদার্থ, মাটির গ্রথন, গঠন, ছিদ্রময়তা, বিক্রিয়া, তাপমাত্রা, পানির উপস্থিতি, পুষ্টি উপাদান, বাতাস ও মাটিস্থ জীবকে মৃত্তিকাজনিত প্রভাবক বলে।

২০. Biotic factor (জীবক প্রভাবক) : মাটিতে বিদ্যমান জীবসমূহ তাদের মিথোস্ক্রিয়া, পরজীব ও মানুষের ভূমিকাকে জীবক প্রভাবক বলে।

২১. Jhoom cultivation (জুম চাষ) : পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীরা পাহাড়ের ঢালে গাছপালা পরিষ্কার করে যে চাষাবাদ করে তাই হলো জুম চাষ।

২২. Soil erosion (ভূমিক্ষয়) : প্রবল বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, নদী ও সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, হিমবাহ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ভূ-উপরিস্থ অংশ আলগা হয়ে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে।

২৩. Soil conservation (ভূমি সংরক্ষণ) : মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা ও ভূমিক্ষয় রোধের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন যেমন— বনভূমি সৃজন ইত্যাদিকে ভূমি সংরক্ষণ বলে।

২৪. Xerophytes (মরু উদ্ভিদ) : বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক ও কঙ্করময় অঞ্চলের উদ্ভিদ।

২৫. Halophytes (লোনামাটির উদ্ভিদ) : লবণাক্ত পানিতে জন্মানো যেমন ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদকে লোনামাটির উদ্ভিদ বলে।

২৬. Ecologial niche (জীবের পেশা বা কার্যধারা) : বাস্তুতান্ত্রিক নিচি বলতে পরিবেশে জীবের বাসস্থান ও কর্মজীবনের প্রকাশ বোঝায়।

২৭. Habitat (বাসস্থান) : কোনো জীবের নির্দিষ্ট আবাস।

২৮. Antoecology (স্ববাস্তুবিদ্যা) : কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতিভুক্ত উদ্ভিদের উপর পরিবেশের প্রভাব।

২৯. Synecology (সিনইকোলজি) : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের উপর পরিবেশের প্রভাব।

৩০. Community (সম্প্রদায়) : সম্প্রদায় হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর সহনশীল, নির্ভরশীল ও ক্রিয়াশীল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ ও অবস্থান।

৩১. Ecological succession বাস্তুতান্ত্রিক ক্রমাগমন) : যেকোনো স্থানে জীবগোষ্ঠীর পর্যায়ক্রমিক উত্তরণকে বাস্তুতান্ত্রিক ক্রমাগমন বলে।

৩২. Energy flow in Ecosystem (বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ) : সূর্য হতে শক্তির রূপান্তর এবং খাদ্যস্তরের বিভিন্ন জীবের মধ্য দিয়ে এর ধারাবাহিক একমুখী প্রবাহ।

৩৩. Nutrient cycling (পুষ্টির চক্রায়ন) : জীবের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলগুলো জীব থেকে ভৌত পরিবেশে এবং ভৌত পরিবেশ থেকে জীব পরিবেশে চক্রায়ন।

৩৪. Carbon cycle (কার্বন চক্র) : প্রাকৃতিক কার্বন যে প্রক্রিয়ায় গ্যাসরূপে পরিবেশে ও জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে সাম্যতা বজায় রাখে তাকে কার্বন চক্র বলে।

৩৫. Nitrogen cycle (নাইট্রোজেন চক্র) : যে পদ্ধতিতে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে, মাটি থেকে জীবদেহে, জীবদেহ থেকে মাটিতে এবং মাটি থেকে পুনরায় বায়ুতে যুক্ত হয়ে সাম্য অবস্থা বজায় রাখে।

৩৬. Biogeography (জীবভূগোল) : জীবের অবস্থান ও বণ্টন সম্পর্কে আলোচিত শাখা।

৩৭. Sanctuary (অভয়ারণ্য) : অবলুপ্তপ্রায় প্রাণীসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুরক্ষিত আবাসস্থল।

৩৮. Endangered species (বিপন্ন প্রজাতি) : যেসব প্রাণী অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হতে পারে তাদেরকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী বলা হয়।

৩৯. Bioremidiation (জীবতাত্ত্বিক প্রতিকার) : জীবাণু, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও এগুলোর উৎসেচক ব্যবহার করে দূষিত পরিবেশকে তার পূর্বাবস্থায় ফেরত দান।

৪০. Biodiversity (জীববৈচিত্র্য) : যে কোনো জীব, তার বৈচিত্র্য, প্রকৃতি ও সহাবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে।

৪১. Living fossil (জীবন্ত জীবাশ্ম) : বর্তমানকালের কোনো জীবিত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অতীতকালের কোনো জীবাশ্ম উদ্ভিদের সাথে বৈশিষ্ট্যের মিল থাকলে তাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। যেমন— সাইকাস (*Cycas*)

৪২. Evaporation (বাষ্পীভবন) : সৌরশক্তি দ্বারা ভূপৃষ্ঠে পানি জলীয়বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে মেঘের সৃষ্টি করে।

৪৩. Hydrolozic cycle (পানিচক্র) : সাগর-মহাসাগর, স্থলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পানির (তরল-বাষ্প-জমাট বাঁধা অবস্থা) চক্রাকারে আবর্তনকে পানিচক্র বলে।

৪৪. Pollution (দূষণ) : রাসায়নিক, ভৌত ও জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের যে কোনো পরিবর্তন হলো দূষণ।

৪৫. Air pollution (বায়ু দূষণ) : বায়ুতে এক বা একাধিক দূষকের উপস্থিতি ও স্থায়িত্ব যেখানকার জীব সম্পদের উপর অথবা অন্যান্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হলে তাকে বায়ু দূষণ বলে।

৪৬. Coloro-floro carbon, CFC (সিএফসি) : CFC হচ্ছে ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও কার্বনের একটি উদ্বায়ী যৌগ, এটি রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, প্লাস্টিক ও রঙ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। CFC বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে।

৪৭. Insecticides (কীটনাশক) : শস্য, শাকসবজি, ফলমূল, গাছপালা রক্ষায় পোকা দমনের জন্য যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাকে কীটনাশক বলে, যেমন— ডায়েলড্রিন, গ্যামাক্সিন ইত্যাদি।

৪৮. Greenhouse effect (গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া) : গ্রিনহাউজের কাচনির্মিত প্রাচীরের মতো পৃথিবীকে ঘিরে বিদ্যমান গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ সূর্যের পতিত তাপ বিকিরণে বাঁধা সৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি করে থাকে। এজন্য গ্রিনহাউজ গ্যাস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াকে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া বলে।

৪৯. Water pollution (পানি দূষণ) : যে কোনো জলাশয়ে শিল্পজাত বা গৃহস্থালীয় বর্জ্য পদার্থ পানিতে বিগলিত হয়ে বা ভাসমান থেকে অথবা তলায় জমে থেকে জলজ বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটালে তাকে পানি দূষণ বলে।

৫০. Noise pollution (শব্দ দূষণ) : শব্দ যখন দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে তখন তাকে শব্দ দূষণ বলে।

৫১. *In situ* conservation (স্বস্থানে সংরক্ষণ) : কোনো উদ্ভিদ প্রজাতি বা জীববৈচিত্র্যকে তার আসল বাসস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণকে *In situ* conservation বলে। যেমন— ন্যাশনাল পার্ক, ইকো পার্ক ইত্যাদি।

৫২. *Ex-situ* conservation (অন্য স্থানে সংরক্ষণ) : কোনো উদ্ভিদ প্রজাতি বা জীববৈচিত্র্যকে তার আসল বাসস্থানের বাইরে জীবিত সংরক্ষণকে *Ex-situ* conservation বলে। যেমন— সংরক্ষণ, টিস্যু কালচার ইত্যাদি।

৫৩. Tissue culture (টিস্যু কালচার) : উদ্ভিদের যে কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন— শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করে পূর্ণাঙ্গ চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি করাকে টিস্যু কালচার বলে।

৫৪. Environmental management (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) : যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায় তাকে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে।

৫৫. Genetic Engineering (জিন প্রকৌশল) : এক কোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করার ক্ষমতাকে জিন প্রকৌশল বলে।

৫৬. Medicinal plant (ভেষজ উদ্ভিদ) : মানুষ বা গবাদি পশুর রোগ নিরাময়ের ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদকে ভেষজ উদ্ভিদ বলে। ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ নির্ভর করে উদ্ভিদে অবস্থিত অ্যালকালয়েড বা উপক্ষারের উপর। যেমন— বাসক, তুলসী, নিম ইত্যাদি।

৫৭. Environmental action (পরিবেশীয় প্রতিক্রিয়া) : পৃথিবীর বিরাজমান পরিবেশের উপর মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের প্রতিক্রিয়া নিরুপণের পদ্ধতিকে পরিবেশীয় প্রতিক্রিয়া বলে।